বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৭ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৬

শিশুশ্রম নিরসনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভূমিকাঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

নাজনীন আহমেদ*
কাশফি রায়ান**
জাবিদ ইকবাল***

১। ভূমিকা

বাংলাদেশে শিশুশ্রমের ব্যাপ্তি ব্যাপক। ২০১৩ সালের শিশুশ্রম জরিপের প্রতিবেদন অনুসারে, বাংলাদেশে এখন প্রায় ১৭ লাখ শিশু শ্রমিক রয়েছে। এরা সপ্তাহে গড়ে প্রায় ৩৯ ঘন্টা কাজ করে এবং সাপ্তাহিক গড় মজুরি ১,৪৮৭ টাকা। এসব শিশু শিক্ষা, বিশ্রাম ও খেলাধুলার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে শৈশবেই জীবিকার জন্য কাজ করতে বাধ্য হয়। অনেক সময় তারা পাচার, নির্যাতন এবং সহিংসতারও সম্মুখীন হয়।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই জাতীয় বিভিন্ন নীতি ও উদ্যোগে শিশু অধিকারের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে যেখানে শিশুশ্রম বন্ধের অঙ্গীকার আছে। বাংলাদেশ সরকার শিশু আইন ১৯৭৪, জাতীয় শিশু নীতি ১৯৯৪, শিশুদের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০০৫-২০১০, শিশুশ্রম জরিপ ২০০২-০৩ ও ২০১৩ এর পাশাপাশি জাতিসংঘের শিশু অধিকার সম্পর্কিত কনভেনশন এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) বিভিন্ন কনভেনশনে শিশু অধিকার সম্পর্কিত নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ সত্ত্বেও বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক শিশুশ্রমিক বিদ্যমান, যা প্রকারান্তরে শিশু অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিচ্ছবি। অনেক দরিদ্র পরিবার তাদের মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য সন্তানদের আয়ের উপর নির্ভর করে। এছাড়াও পরিবারবিহীন অনাথ শিশুরা বেঁচে থাকার জন্য খুব অল্প বয়সেই কাজ শুরু করে। এই কারণেই শ্রম বাজারে শিশু শ্রমিকদের যোগানের অভাব হয় না। অন্যদিকে নিয়োগকর্তারা প্রায়ই শিশুদের কাজে নেয় কারণ তাদেরকে প্রাপ্ত বয়স্কদের চেয়ে অনেক কম বেতন দেয়া যায় এবং এরা অনেক বেশি অনুগত। ফলে শিশুদের দিয়ে কম বেতনে কাজ করানোর প্রবণতার কারণে শিশু শ্রমিকের চাহিদাও ব্যাপক লক্ষণীয়। এভাবে শিশুশ্রমের চাহিদা ও যোগান এ উভয় দিকের প্রভাবেই বাংলাদেশে শিশুশ্রমের ব্যাপকতা দৃশ্যমান।

বাংলাদেশ শিশুশ্রম জরিপ ২০১৩ অনুযায়ী, যেসব শিশু-কিশোরের বয়স ১২ বছরের ঊর্ধ্বে এবং যারা সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৪২ ঘন্টা হালকা পরিশ্রমের কাজে নিয়োজিত আছে, তারাই কর্মজীবী শিশু। অপরদিকে শিশু শ্রমিক বলতে বোঝানো হয়েছে এমন কর্মজীবী শিশুদের, যাদের বয়স ১২ বছরের কম এবং যাদের সপ্তাহে ৪২ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে হয় (UNICEF, ILO, World Bank Group 2009)। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী যেকোনো চাকুরিতে নিয়োগ দেয়ার জন্য নিয়োগ-প্রার্থীর

*সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস।
**গবেষণা সহযোগী, বিআইডিএস।
***রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস।

বয়স সর্বনিম্ন ১৪ বছর হতে হবে, এর চেয়ে কম বয়সের কাউকে নিলে, ঐ প্রার্থীকে শিশু শ্রমিক হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এছাড়াও শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয় এমন ধরনের প্রায় ৩৮টি কাজকে সরকার ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হিসেবে লিপিবদ্ধ করেছে এবং এ ধরনের কাজে শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে (টীকা-৭ এ বিস্তারিত) ।

শিশুশ্রমের সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশ সরকার নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সকল ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এবং ক্ষতিকর কাজে শিশুশ্রমকে নিষিদ্ধ করে "জাতীয় শিশুশ্রম নির্মূল নীতি ২০১০"[১] (National Child Labour Elimination Policy 2010) প্রণয়ন করেছে। শুধু তাই নয়, এ নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NPA)[২] গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনার আওতায় সরকার জাতীয় বাজেটের অধীনে শিশু ফোকাস বাজেট, শিশু সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ইত্যাদি উদ্যোগ নিয়েছে।

শিশুশ্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো দারিদ্র্য (Gahlaut 2011)। তাই দারিদ্র্যতা কমানোর মাধ্যমে শিশুশ্রম কমিয়ে আনা যেতে পারে। দারিদ্র্যতা নিরসনে বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় নানা ধরনের কর্মসূচি চালু রয়েছে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন– সেভ দ্যা চিল্ড্রেন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), কেয়ার বাংলাদেশ, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুশ্রম অবসানের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। "জাতীয় শিশুশ্রম নির্মূল নীতি" এবং এর বাস্তবায়নে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা শিশুশ্রম বন্ধ করার ভিত্তি রচনা করেছে। জাতীয় কর্মপরিকল্পনার ৭.১.৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির" একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে শিশুশ্রম নির্মূল করাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, "জাতিসংঘের সামাজিক সুরক্ষা উদ্যোগ"-এ স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে নিশ্চিত করতে হবে যে, দেশের সকল শিশু যেন ন্যূনতম আয়ের সুবিধাটুকু ভোগ করে যার মাধ্যমে পুষ্টি, শিক্ষা ও যত্নের মৌলিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। এক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে অর্থ বা অন্যান্য উপাদান প্রদান করে শিশুশ্রম নিরসনে কার্যকর ফল লাভ সম্ভব।

১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য ও গবেষণা পদ্ধতি

এই প্রবন্ধটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের শিশু শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থা জানা, বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলো পর্যালোচনা করা এবং বিশেষভাবে এগুলোর মধ্যে শিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কী ধরনের কার্যক্রম রয়েছে সেগুলোর উপর আলোকপাত করা। এই উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে শিশুশ্রম এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের জন্য এই প্রবন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে–

ক) শিশুশ্রম নিরসনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে তার বিশ্লেষণ;

---

[১] *National Child Labour Elimination Policy 2010*, Ministry of Labour and Employment, Government of the People's Republic of Bangladesh, March 2010.

[২] *National Plan of Action for Implementing the National Child Labour Elimination Policy, 2012-2016*, Ministry of Labour and Employment, Government of the People's Republic of Bangladesh, April 2013.

খ) বাংলাদেশে শিশু শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থা এবং তার কারণ পর্যালোচনা;
গ) শিশু সুরক্ষা এবং শিশুশ্রম নিরসনের জন্য গৃহীত রাষ্ট্রীয় নীতি এবং কেন্দ্রীয় কর্মসূচির পর্যালোচনা।
ঘ) বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ এবং শিশুশ্রম পুরোপুরি নির্মূল করার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ।

এই প্রবন্ধে বিভিন্ন পরিসংখ্যান, সমীক্ষা, কর্মসূচি প্রতিবেদন ইত্যাদি থেকে তথ্য উপাত্ত (Secondary Source) সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষ করে Child Labor Survey Bangladesh 2013, Child Focused Budget (2018-19), এবং ILO ও UNICEF- এর শিশুশ্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় প্রতিবেদন থেকে তথ্য সংযুক্ত করা হয়েছে। সেই সাথে শিশুশ্রম বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, শিশুশ্রম নিরসনে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সাক্ষাৎকারগুলো ও তাদের মতামত পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২। "সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি"এবং শিশুশ্রম নিরসনের মধ্যকার সম্পর্ক

শিশুশ্রম উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান একটি সমস্যা যা দারিদ্র্যের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত এবং তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে দারিদ্র্যের দুষ্ট শৃঙ্খল তৈরি করে। দরিদ্রতার কারণেই শিশুরা শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে অল্প বয়সেই উপার্জনে নেমে পড়ে; ফলে ভবিষ্যতে তাদের পর্যাপ্ত আয়মূলক কাজের সুযোগ কমে যায়। এই শিশুদের ভবিষ্যৎ 'স্বল্প শিক্ষা স্বল্প আয়' পরিক্রমায় ঘুরপাক খেয়ে দরিদ্র্যের দুষ্টচক্রের অংশ হয়ে যায় (Gahlaut 2011)। এই চক্র থেকে উত্তরণের পথ হিসেবে দরিদ্র্য হ্রাস বা দূর করার মাধ্যমে শিশুদের স্কুলে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা এবং ভবিষ্যতে দক্ষকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিশুশ্রম বন্ধ করা অত্যাবশ্যক।

শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া এবং শিশু শ্রমিক হওয়ার পেছনে 'পুশ' বা ধাক্কা এবং 'পুল' বা টান এ দুই কারণই কাজ করে। অনুন্নত বা নিম্নমানের শিক্ষা, অপ্রাসঙ্গিক অনুশীলন ও পাঠ্যক্রম, শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের কথ্য বা মৌখিক যোগাযোগের ভাষায় দক্ষতার অভাব, সেই সঙ্গে অপর্যাপ্ত স্কুল সংখ্যা এবং দুরূহ যাতায়াত ব্যবস্থা –এ বিষয়গুলো শিশুদের স্কুলে যেতে নিরুৎসাহিত করে বা স্কুল থেকে 'ধাক্কা' দিয়ে বের করে আনে (Zaman *et al.* 2014)। অপরদিকে পরিবারগুলো অর্থনৈতিক সমস্যা ও দারিদ্র্যে নিপতিত হয়ে অধিকতর আয়ের পথ হিসেবে শিশুদের উপার্জনমুখী কাজে নিযুক্ত করে, যা স্কুল হতে শিশুদের 'টান' দিয়ে বের করে আনে। বাংলাদেশের বিদ্যমান সামাজিক মূল্যবোধ শিশু শ্রমের প্রতি সহনশীল; সেই সাথে স্কুল থেকে পাস করে কাজের সুযোগের অভাবের দরুণ পরিবারগুলো শিশু শিক্ষায় বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত হয় (World Report on Child Labour 2013)।

সাধারণত শৈশবের দারিদ্র্য পরিণত বয়সের দারিদ্র্যের মূল কারণ (Munujin *et al.* 2009)। শিশুশ্রম ও ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত শিশুরা দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ে এবং এটি তাদের শিক্ষা জীবন থেকে বঞ্চিত করে মানসিক বিকাশ ও দক্ষতা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। এসব ক্ষতি পরবর্তী জীবনে কাটিয়ে ওঠা কঠিন হয়। এ ধরনের বঞ্চনাজনিত প্রভাব প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চালিত হয়ে দারিদ্র্য-চক্র গড়ে তোলে, যাতে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। "মানব পুঁজিতে

বিনিয়োগ" সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলোর মূল কথা হলো–যদি শিশু শিক্ষাকে আমরা অর্থনীতির ভাষায় 'স্বাভাবিক দ্রব্য' (Normal Good) হিসেবে বিবেচনা করি, তবে পরিবারের উপার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে স্কুলে শিশুদের অংশগ্রহণও বৃদ্ধি পাবে (Behram and Knowles 1999)। Basu and Van's (1998) এর Luxury Axiom, অথবা "বিলাসিতার স্বতঃসিদ্ধ নীতি" অনুসারে একটি পরিবারের গড় উর্পাজন বা আয় যদি জীবনধারণের জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় যে আয়, তা অতিক্রম করে তবেই শিশুশ্রম উল্লেখযোগ্য হারে কমবে। চিত্র ১ এ দরিদ্রতার সাথে শিশুশ্রমের সম্পর্ক এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির হস্তক্ষেপের মাধ্যমে শিশুশ্রম কিভাবে কমানো যায় তা তুলে ধরা হলো।

চিত্র ১: দরিদ্রতার সাথে শিশুশ্রমের সম্পর্ক

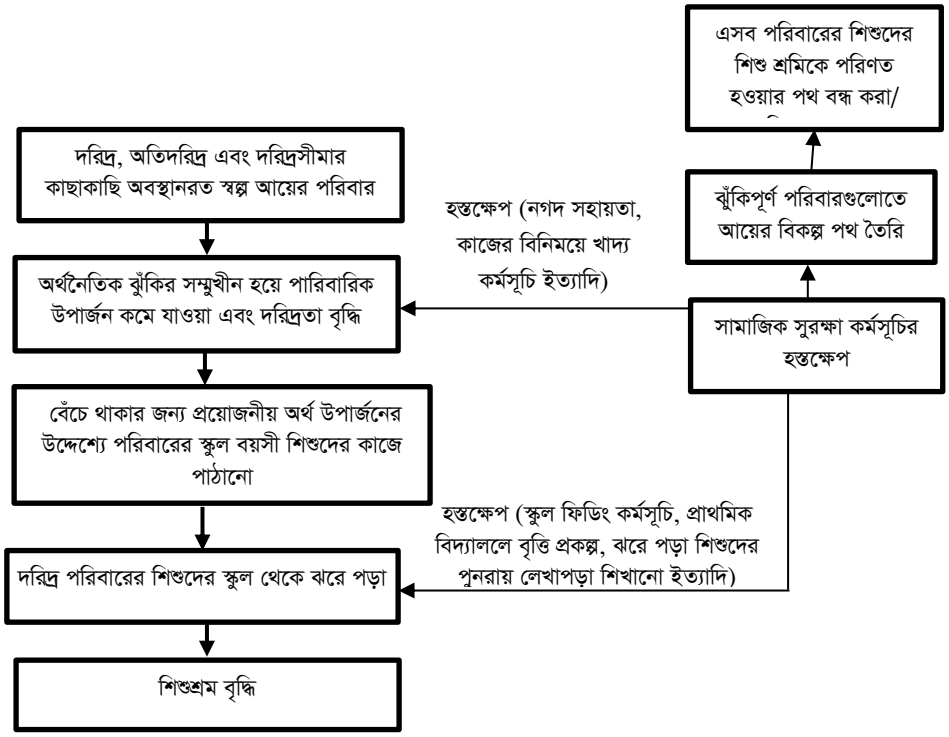

"সামাজিক সুরক্ষা" এর মূলনীতিই হলো দরিদ্র্যতা, বিচ্ছিন্নতা এবং অসহায়ত্ব থেকে সমাজের লোকদের বের করে আনা, এই কারণগুলোই শিশুদের শ্রমিকে রূপান্তর হওয়ার অন্যতম অনুঘটক (Singh and Mc Leish 2013)। এ জন্যেই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো অনুন্নত (LDC) উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপার্জন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে। এ কর্মসূচিগুলো শুধু দারিদ্র্য নিরসনই নয়, সেই সাথে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য সংবেদনশীল কার্যক্রমের

মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যেও কাজ করে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার তিনটি সম্ভাব্য উপায় রয়েছে:

১) প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে শিশু সুরক্ষার লক্ষ্যগুলো অন্তর্ভুক্ত করা;

২) দারিদ্র্যক্লিষ্ট এবং সামাজিক সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শিশুশ্রম হ্রাস করা এবং

৩) সর্বশেষে সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা এবং শিশু সুরক্ষার গৃহীত কার্যক্রমগুলো সফল করা (Barrientos *et al.* 2013)।

সিং এবং ম্যাকলিশ (Singh and Mc Leish 2013) বলেছেন যে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি তিনটি প্রত্যক্ষ পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুশ্রম প্রতিহত করতে পারে, প্রথমত, পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটালে, তাদের সন্তানদের বাইরে কাজে পাঠানোর প্রয়োজন কমে যাবে, যার কারণে শিশুরা স্কুলে বেশি সময় ধরে থাকবে। দ্বিতীয়ত, পরিবারগুলোর বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলা করার দক্ষতা বাড়ালে তারা আর শিশু সন্তানদের উপার্জনের উপর নির্ভর করবে না এবং তাদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেবে না। তৃতীয়ত, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় নির্দিষ্ট কিছু ফলাফল অর্জনের জন্য ইতিবাচক উৎসাহ অথবা নগদ অর্থ (Incentive) প্রদানের ব্যবস্থা রাখা, যা শিশুদের উপার্জনের চেয়ে স্কুলে থাকাকে অনুপ্রাণিত করবে। এছাড়াও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুদের জন্য বিভিন্ন সামাজিক সেবা, পুষ্টি এবং শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয় (Sanfillippo *et al.* 2012)। আইএলও (২০১৪) এর মতে, সামাজিক নিরাপত্তা/সুরক্ষা কর্মসূচিগুলো শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে একটি কেন্দ্রীয় স্তম্ভের মতো কাজ করে কিন্তু অন্যান্য সামাজিক সহায়তা কৌশল ব্যতিত শিশু শ্রমকে পুরোপুরিভাবে নির্মূল করতে এটি পারে না (ILO 2014) ।এ কারণেই আইএলও শিশুদের সুরক্ষার জন্য একটি "সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার" প্রস্তাব করে।

অন্যান্য যেসব সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে শিশুশ্রম হ্রাস করে, সেগুলি হলো- গরীব পরিবারে নগদ বা বিভিন্ন ভাতা প্রদান, প্রতিবন্ধী ভাতা, দরিদ্র মা এর জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা এবং কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মায়ের সহায়তা তহবিল, স্বাস্থ্য বীমা এবং স্বাস্থ্য সেবার আওতায় অন্তর্ভুক্তি, বিভিন্ন ধরনের খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম, এবং বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (ILO 2014, Singh and Mc Leish 2003)।

সুতরাং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোর মাধ্যমে "শিশুশ্রম" নিরসন একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। বিশেষভাবে সেই কর্মসূচিগুলো যদি শিশুদের স্কুলে অংশগ্রহণের প্রতি জোর দেয়, তাহলে শিশুরা আর বাইরে কাজ করার সুযোগ পায় না (Barrientos *et al.* 2013)। সেই সাথে পাঠ্যক্রমের বাইরে বিভিন্ন ধরনের সৃজনশীল কাজ, যেমন– খেলাধুলা, গান, ছবি আঁকা এগুলো যোগ করা হলে আরও বেশি সফলভাবে কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়িত হবে। শিশুরা যত বেশি সময় স্কুলে পাঠক্রমের সাথে সাথে এসব সৃজনশীল কাজে অংশ নেবে ততই তাদের বাইরে কাজ করার শ্রম-ঘন্টা কমবে। এইসব কারণেই বেশিরভাগ তত্ত্বীয় গবেষণাপ্রবন্ধ এবং প্রকাশনাসমূহে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোকে প্রত্যক্ষভাবে স্কুলে

শিশুদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং এর ফলে পরোক্ষভাবে শিশুশ্রম হ্রাসের অন্যতম কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

আইএলও-এর "বিশ্ব সামাজিক সুরক্ষা" (২০১৭) প্রতিবেদনের মতে, টেকসই উন্নয়ন অর্জন, সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রসার এবং সামাজিক সুবিধাগুলো ভোগ করার মাধ্যমে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা–এই নীতিগুলো বাস্তবায়নে "সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি" গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ প্রতিবেদনের আলোচনা থেকেও দেখা যাচ্ছে যে, নগদ অর্থ প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের ভাতা, শিশুদের সুস্থ বিকাশ ও স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করে। এর মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন, শিশু-মৃত্যু প্রতিরোধ এবং শিশুশ্রম হ্রাস –এই উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি তাই শিশুদের সুপ্ত সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করতে এবং একটি মানসম্মত জীবনযাত্রার মান উপভোগ করার সুযোগ তৈরিতে সহায়তা করে। এ কারণেই আইএলও তার Social Protection Floors Recommendation 2012 এর ২০২ নম্বর সুপারিশমালায় দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই জাতীয়ভাবে সংঙ্গায়িত "সামাজিক সুরক্ষা ভিত" প্রতিষ্ঠা করা উচিত, যার মধ্যে দরিদ্র, দুর্বল এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর মৌলিক সামাজিক অধিকার ও সুরক্ষার জন্য অবশ্যই নিম্নলিখিত চারটি গ্যারান্টি অন্তর্ভুক্ত হবে–

ক) সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার সাথে জরুরি যত্ন এবং মাতৃসেবা নিশ্চিত করা;

খ) শিশুদের জন্য ন্যূনতম আয়ের নিরাপত্তা বিধান করা যা তাদের পুষ্টি, শিক্ষা ও জীবনধারনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য পণ্য ও সেবার প্রাপ্তি নিশ্চিত করে;

গ) সক্রিয় বয়সের ব্যক্তিদের জন্য "ন্যূনতম আয়ের নিরাপত্তা" বজায় রাখা এবং সবশেষে;

ঘ) বয়স্ক জনগোষ্ঠীর মৌলিক আয় নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ এমন একটি সম্ভাবনাময় দেশ, যা ২০২৪ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর তালিকায় অর্ন্তভুক্ত হতে যাচ্ছে। অথচ এখনও গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলেই শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান, যা টেকসই মানব উন্নয়নের পথে একটি বিশাল বাধা। সেজন্যই টেকসই মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য "শিশু শ্রম" কে নির্মূল করা অত্যাবশ্যক। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলো এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

৩। বাংলাদেশে শিশুশ্রমের অবস্থা

৩.১। বাংলাদেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা, ব্যাপ্তি ও বৈশিষ্ট্য

২০১৭ সালের আইএলও (ILO 2017) এর সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী, পৃথিবীর ৯০ কোটি চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্ধেকই হচ্ছে শিশু। বাংলাদেশেও একই রকম চিত্র আমরা দেখতে পাই। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ শিশু (Child Budget 2018-19)। বাংলাদেশ শিশুশ্রম জরিপ ২০১৩- এ প্রাপ্ত উপাত্ত অনুযায়ী ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী সাড়ে ৩৪ লাখ কর্মে নিযুক্ত শিশুদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই হল (১৭ লাখ) শিশু শ্রমিক।[৩] শিশু শ্রমিকদের এই সংখ্যা শিশু

[৩] সংজ্ঞা অনুসারে অবশিষ্ট কর্মজীবী শিশুরা শিশু শ্রমিকের অন্তর্ভুক্ত নয়।

জনসংখ্যার প্রায় ৪.৩ শতাংশ এবং কর্মে নিযুক্ত শিশুদের ৪৯.৩ শতাংশ। সেভ দ্যা চিলড্রেন এর (২০১৪) সমীক্ষা অনুসারে, বাংলাদেশে প্রতি ৬ জন শিশুর মধ্যে ১ জন শিশু কোনো না কোনো ধরনের উপার্জনমুখী কাজে যুক্ত আছে। চিত্র-২ অনুসারে শিশু শ্রমিকদের মধ্যে ১২ লাখ ৮০ হাজার শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত আছে।

চিত্র ২: বাংলাদেশে কর্মরত কর্মজীবী শিশু এবং শিশু শ্রমিকের সংখ্যা, ২০১৩

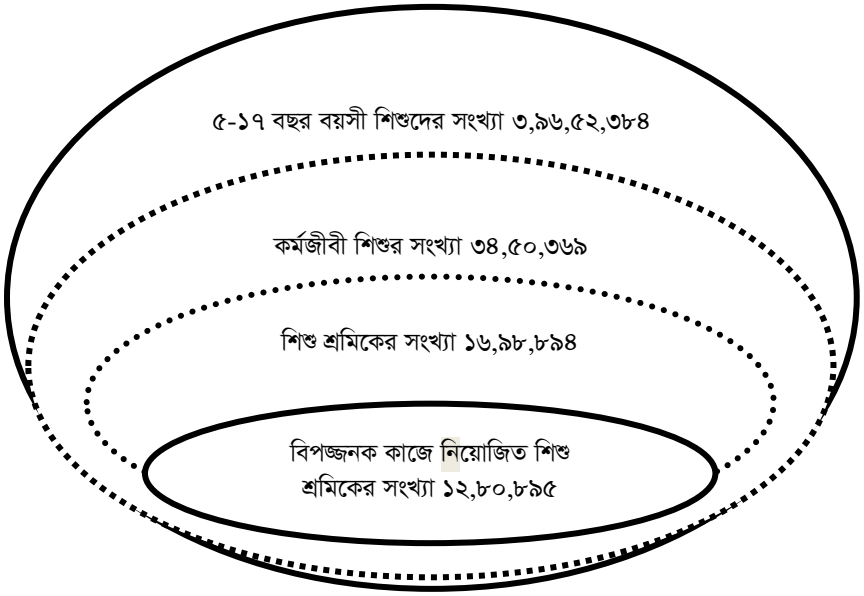

উৎস: National Child Labour Survey, 2013.

চিত্র ৩-এ মোট শিশু জনসংখ্যা এবং শিশু শ্রমিকদের একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। শিশুশ্রম সমীক্ষা ২০০২-০৩ এবং ২০১৩ এর প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত চিত্রে দেখা যায় যে, ২০০২-০৩ সাল থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে শিশু শ্রমিকদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। তবে লক্ষ্যণীয় যে, ছেলে শিশু শ্রমিকের তুলনায় মেয়ে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হ্রাস পেয়েছে। শুধু তাই নয়, সর্বমোট মেয়ে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ৭,২০,০০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭,৫০,০০০-এ উন্নীত হয়েছে। এর মানে মেয়েদের মধ্যে শিশুশ্রম আগের তুলনায় বেড়েছে, অপরদিকে ছেলেদের মাঝে কমেছে। মোট মেয়ে শিশুর মধ্যে মেয়ে শিশুশ্রমের ব্যাপকতা ৩.৬৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৯১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে কিন্তু মোট ছেলে শিশুদের মধ্যে ছেলে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ১০.৮৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৪.৬৩ শতাংশে পৌঁছেছে।

চিত্র ৩: বাংলাদেশে শিশুশ্রমের বিস্তৃতি

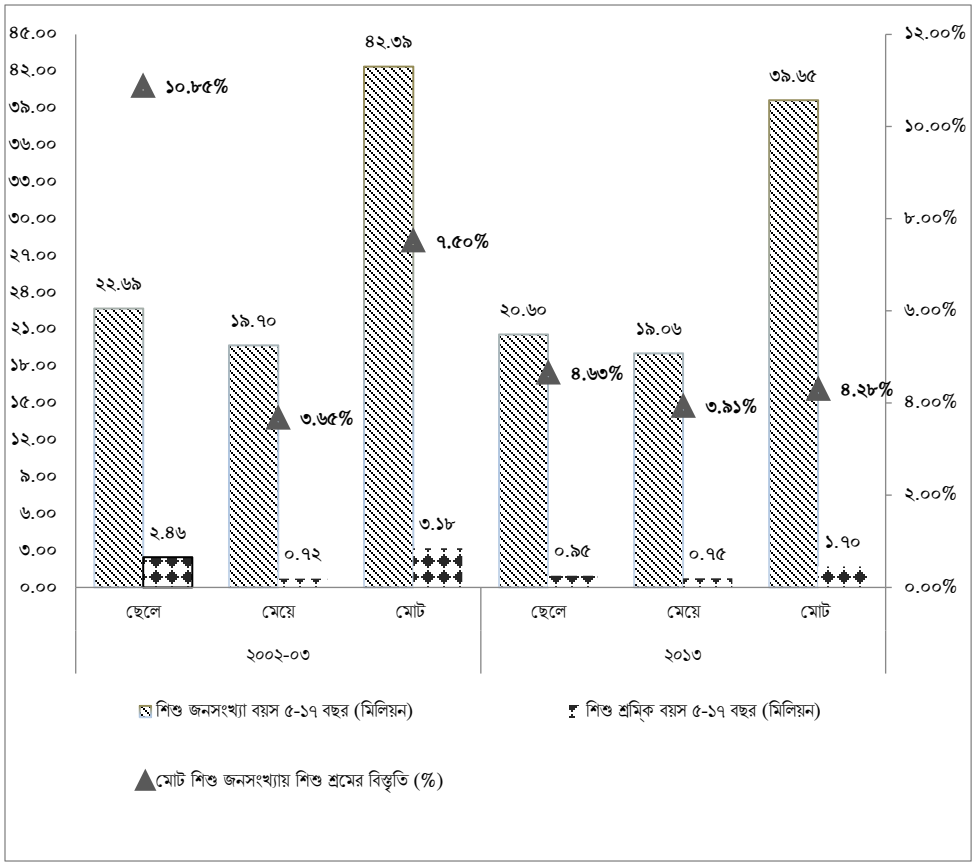

উৎস: Bangladesh Child Labor Force Surveys, 2002-03 and 2013.

চিত্র ৪-এ বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত কর্মজীবী শিশুর সংখ্যা এবং শিশু শ্রমিকদের সংখ্যা বিভিন্ন সেক্টরে তাদের (employment) কর্মসংস্থান অনুযায়ী দেখানো হয়েছে। এই চিত্র থেকে দেখা যায় যে, ২০১৩ সালেও প্রায় ৯৫ শতাংশ কর্মজীবী শিশু অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করে, যেটি ২০০২-০৩ এর সমীক্ষার চেয়ে প্রায় ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত বেশির ভাগ শিশুই কর্মক্ষেত্রে অপব্যবহার, দুর্ঘটনা ও ঝুঁকির সম্ভাবনায় থাকে। এছাড়াও ছেলে শিশু শ্রমিকদের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত হওয়ার হার আগের চেয়ে প্রায় ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, অপরদিকে মেয়ে শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক খাতে অংশগ্রহণের হার বেড়েছে। এর কারণ হলো শিল্পখাত বিশেষ করে দেশীয় তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মজীবী মেয়ে শিশুদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হওয়া (Child Labour Survey, Bangladesh 2013, p.117)।

চিত্র ৪: প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শিশুদের বিন্যাস

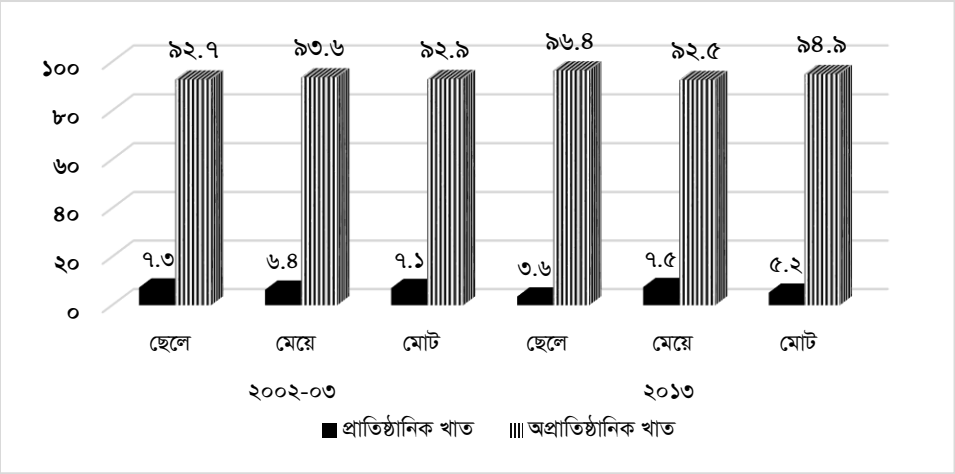

উৎস: Bangladesh Child Labour Surveys, 2002-03 and 2013.

এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যে, শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ হলো কর্মবাজারে শিশু শ্রমিকের চাহিদা। কারণ কিশোর শ্রমিকদের অনুমোদিত কর্মঘণ্টার চেয়েও বেশি সময় কাজ করানো যায়। সেই সাথে দরিদ্র পরিবারে বাড়তি উপার্জনের লক্ষ্যে এসব কিশোরদের উপর শ্রম বাজারে যোগ দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। এ কারণেই ১৪-১৭ বছর বয়সীদের মধ্যে শ্রমবাজারে আসার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি (চিত্র ৫) এবং এই বয়সী ছেলে-মেয়েরাই কাজের চাপে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়।

চিত্র ৫: বিভিন্ন বয়সের শিশুদের মধ্যে শিশুশ্রমের ব্যাপ্তি

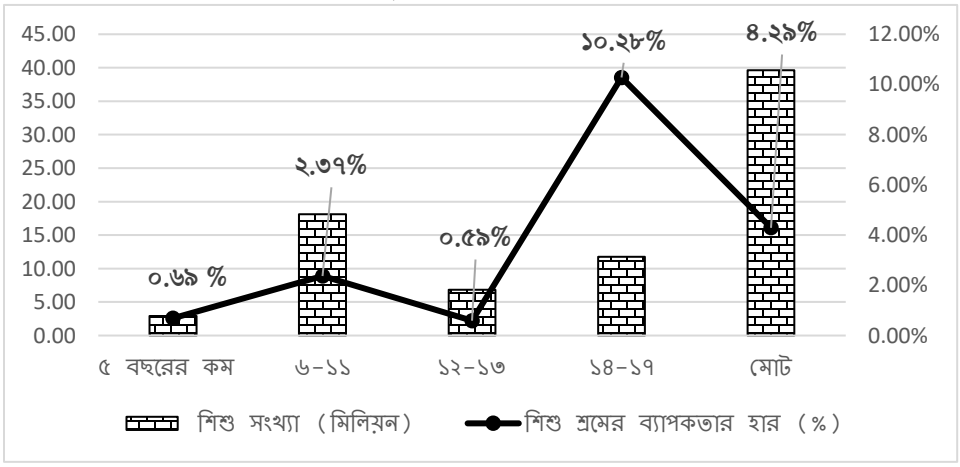

উৎস: Bangladesh Child Labour Survey 2013, page 112-এর ভিত্তিতে লেখকবৃন্দ কর্তৃক নির্ণীত।

চিত্র ৫-এ ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশু শ্রমিকদের ৪টি বয়স কাঠামোতে বিন্যাস করে তার পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ থেকে দেখা যায় যে, শিশুদের চারটি বয়স কাঠামোর মধ্যে ১৪-১৭ বছর বয়স কাঠামোতে সর্বোচ্চ শিশু শ্রমিক রয়েছে, যার সংখ্যা প্রায় ১২ লাখ। শিশুশ্রমের ব্যাপকতার হারও এই ১৪-১৭ বয়সের মধ্যে সবচেয়ে বেশি, প্রায় ১০.২৮ শতাংশ[৪]। বাংলাদেশ শিশু শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৩ অনুযায়ী প্রায় ১২ কোটি ৮০ লাখ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ[৫] কাজে জড়িত –যা ঐ সময়ের কর্মজীবী শিশুর প্রায় ৩৭.১০ শতাংশ (সারণি ১)। বিশেষ করে, কর্মজীবী শিশুদের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের শতকরা ভাগ ১৭.৩৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩ সালে ৩৭.১০ শতাংশে পৌঁছেছে। শুধু তাই নয়, শিশু শ্রমিকদের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত মোট শিশুর শতকরা হার ৪০.৬১ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭৫.৩৪ ভাগে।

সারণি ১: ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের শতকরা হার

বৈশিষ্ট্য	২০০২-০৩			২০১৩		
	ছেলে শিশু	মেয়ে শিশু	মোট	ছেলে শিশু	মেয়ে শিশু	মোট
শিশু শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা কতভাগ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত	৪৭.৬২	১৬.৭১	৪০.৬১	৮১.০১	৬৮.১০	৭৫.৩৪
কর্মজীবী শিশুদের মধ্যে শতকরা কতভাগ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত	২১.৪২	৬.১৫	১৭.৩৯	৩৬.৭১	৩৭.৭১	৩৭.১০

উৎস: Bangladesh Child Labor Survey 2013, p.177-এর ভিত্তিতে লেখকবৃন্দ কর্তৃক নির্ণীত।

সরকারের বিভিন্ন নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উন্নয়ন হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ শিশু শ্রমশক্তি জরিপ ২০০২-০৩ এর তুলনায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে ২০১৩-এ (সারণি ১)। লক্ষণীয় যে– ছেলে শিশুদের তুলনায় মেয়ে শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণের হার ২০০৩ সালের চেয়ে ২০১৩ সালে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ হলো– প্রাতিষ্ঠানিক কাজে মেয়ে শিশুর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং সেই সাথে পূর্ণকালীন চাকুরির (Full-time) লোভনীয় প্ররোচনা। এ কারণেই প্রায় ৫.১ লাখ কর্মজীবী মেয়ে শিশুদের মধ্যে ৯৮.০১ শতাংশই পূর্ণকালীন চাকুরিতে নিযুক্ত রয়েছে (Child Labour Survey, Bangladesh 2013, p.74)। শিশুশ্রম জরিপ ২০১৩ এ প্রধান পেশা অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম এর বিন্যাসে দেখা যায় যে, ১২ লাখ ৮০ হাজার

[৪]শিশু শ্রমের ব্যাপকতার হার (%) = (সর্বমোট শিশু শ্রমিক/সর্বমোট শিশু জনসংখ্যা) × ১০০

[৫] বাংলাদেশ শিশু শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৩ এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের শিল্প এবং বাণিজ্য খাতে কর্মরত শিশুরা যেমন– অ্যালুমিনিয়াম বা অ্যালুমিনিয়াম জাত দ্রব্য তৈরি, অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ, কাঁচ, প্লাস্টিক বা রাবার সামগ্রী তৈরি, ম্যাচ তৈরি, সাবান বা ডিটারজেন্ট তৈরি, ইট বা পাথর ভাঙ্গা, লবণ তৈরি, চামড়াজাত দ্রব্য তৈরি, জাহাজ ভাঙ্গা, ট্রাক-টেম্পো বা বাস হেল্পার ইত্যাদি জায়গায় কাজ করলে এবং সেই সাথে কৃষি, বনজ ও মৎস্য খাতে দক্ষ শ্রমিক, সেবা এবং বিক্রয় কর্মী হিসেবে ১২ ঘণ্টার বেশি এবং সপ্তাহে ৪২ ঘণ্টার বেশি কাজ করলে তা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে।

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমিকের মধ্যে হস্তশিল্প ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় নিযুক্ত রয়েছে প্রায় ৪৪ শতাংশ, প্রাথমিক পেশায় ১৯ শতাংশ, সেবা ও বিক্রয় কাজে ১৬ শতাংশ, কৃষি, বন ও মৎস্য খাতে ১৫ শতাংশ এবং অন্যান্য কাজে ৬ শতাংশ।

উপরের আলোচনা থেকে এটাই প্রতিফলিত হয় যে, যদিও ২০০২-০৩ সাল থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে শিশু শ্রমিকদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু এর সাথে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত কর্মজীবী শিশুদের এবং শিশু শ্রমিকদের শতকরা ভাগ পূর্বের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। এর অর্থ হলো সংখ্যার দিক থেকে যদিও মনে হচ্ছে দেশে শিশু শ্রমিক কমেছে, কিন্তু যেসব শিশু ইতোমধ্যে কোনো না কোনোভাবে কাজে জড়িত তাদের ঝুঁকিযুক্ত কাজে আটকে পড়ার প্রবণতা আগের চেয়ে বেড়েছে।

৩.২। বাংলাদেশে শিশুশ্রমের মূল কারণ: কোন বিষয়গুলি শিশুদের উপার্জনমুখী কাজের দিকে ঠেলে দেয়?

তাত্ত্বিক ও পরীক্ষামূলক উভয় গবেষণায় দেখা গেছে যে, অর্থনৈতিক দুর্বলতা– যা দরিদ্রতা, ঝুঁকি ও আকস্মিক বিপত্তির সঙ্গে জড়িত তা শিশুদের উপার্জনের দিকে ঠেলে দেয়। তবে শিশুশ্রম শুধুমাত্র দরিদ্রতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এটি এমন একটি চলমান প্রক্রিয়া যা অনেকগুলো বিষয়ের সমষ্টিগত পরিণতি। যেহেতু দরিদ্রতাই শুধুমাত্র শিশুশ্রমের কারণ নয়, তাই শুধুমাত্র 'দরিদ্রতা নিরসন' কৌশল দিয়ে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

চিত্র ৬: বিভাগ অনুযায়ী দরিদ্রতার হার (%) এবং শিশুশ্রমের বিদ্যমান হারের (%) বিন্যাস

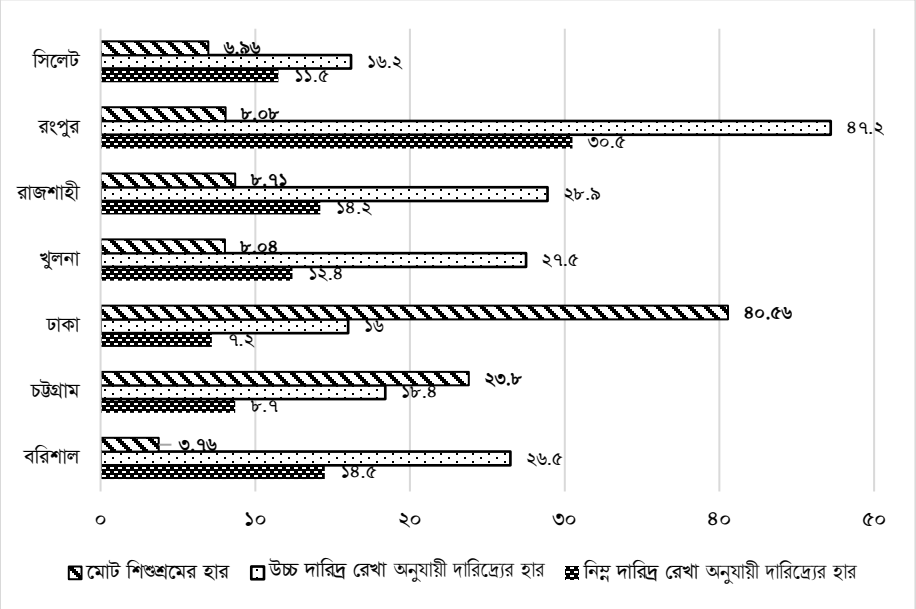

উৎস: Child Labor Survey 2013 HIES, 2010.

চিত্র ৬ থকে দেখা যায়, বাংলাদেশের যে সমস্ত বিভাগে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী দরিদ্রতার হার তুলনামূলকভাবে কম, সেখানে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে শিশু শ্রমের হার সর্বোচ্চ অথচ দরিদ্রতার হার বেশি যথাক্রমে রংপুর, বরিশাল ও রাজশাহী বিভাগে। দারিদ্র পীড়িত উপজেলা থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রামের নগরাঞ্চলের দিকে অভ্যন্তরীণ অভিবাসনই এ ঘটনার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের দারিদ্র্যের উপর সম্পাদিত এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, ইট ভাটায় কাজ করার জন্য অনেক দরিদ্র্য লোকই মঙ্গা মৌসুমে পুরো পরিবারসহ শহরে চলে আসে, যে কারণে এসব পরিবারের শিশুরা পড়ালেখা শেষ করতে পারে না (Rahmana and Rana 2016)। এছাড়াও প্রতি বছর বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার হয়ে, জমি এবং কর্মসংস্থান হারিয়ে প্রায় ৫ লাখ মানুষ গ্রামীণ এলাকা থেকে শহর এলাকায় অভিবাসী হয়ে আসছে (World Bank 2016)। এভাবেই শহর দরিদ্রদের সংখ্যা বাড়ছে। এসব দরিদ্র গ্রামীণ জনগোষ্ঠী শহরের পরিত্যক্ত বা খাস জমিতে অবৈধ বসতি স্থাপন করে দুর্দশাগ্রস্ত জীবনযাপন করে। এসব বস্তিতে জন্মনিবন্ধন হার জাতীয় গড়ের চেয়ে প্রায় অর্ধেক, বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া এবং পুন:রায় ভর্তি হওয়া শিশুর সংখ্যাও প্রচুর। এ কারণেই বস্তিগুলোতে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা জাতীয় পরিসংখ্যানের তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেশি (UNICEF 2010)। শহরের দারিদ্র্য প্রবণতা গ্রামীণ এলাকার সমস্যা থেকে বেশ আলাদা। শহরের দরিদ্র বস্তিবাসীরা পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও বিদ্যুতের স্থিতিশীল সরবরাহবিহীন, নাগরিক সুবিধা বঞ্চিত নোংরা ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করে বিধায় এখানে শিশু শ্রমিকের চাহিদা অনেক বেশি। সিটি করপোরেশন এলাকায় কর্মজীবী শিশুদের মাসিক মজুরি গড়ে প্রায় ৬,৯৫২ টাকা, যা অন্যান্য এলাকার চেয়ে বেশি (Child Labour Survey 2013)। তাই জীবনযাত্রার বাড়তি খরচের যোগান দিতে পরিবারগুলো শিশুদেরকে কাজে পাঠায়।

শিশু শ্রমিকদের প্রায় ৬৩ শতাংশই বর্তমানে স্কুলে পড়ছে না এবং এদের ৮.৪ শতাংশ কখনও স্কুলে পড়েনি (Child Labour Survey 2013, p.75)। এছাড়াও ১৪-১৭ বছর বয়সী প্রায় ১২ লাখ শিশু শ্রমিকের মধ্যে মাত্র ১৯.৬ ভাগ স্কুলে পড়েছে। চিত্র ৭-এ শিশু শ্রমিকদের কখনই স্কুলে না যাওয়ার প্রধান কারণগুলো তুলে ধরা হয়েছে। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণ বা পারিবারিক উপার্জনে অংশ নেয়া শিশুদের স্কুলে না যাওয়ার কারণ নয়। অনেক সময় পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক মনোভাব যেমন– মেয়েদের স্কুলের শিক্ষার কোনো দরকার নেই অথবা মেয়ে শিশুদের অবশ্যই ঘরের কাজ করা উচিত –এসব ধারণার কারণে অনেক সময় পিতামাতা বাচ্চাদের স্কুলে যেতে দেয় না। বিশেষ করে ৬-১১ বছর বয়সী মেয়ে শিশুকে স্কুলে ভর্তি করানোর ব্যাপারে দরিদ্র পরিবারের মা-বাবার অনীহা রয়েছে। প্রায় ৫৫ হাজার শিশু শ্রমিক কখনই স্কুলে ভর্তি হয়নি, কারণ তাদের বাবা-মা তাদের স্কুলে দিতে চায় না। ১১ বছরের বেশি বয়সী বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মা-বাবার এ মনোভাব পরবর্তীতে পরিবর্তন হয় কী না, সে বিষয়ে কোনো তথ্য নেই।

চিত্র ৭: শিশু শ্রমিকদের কখনোই স্কুলে অংশগ্রহণ না করার কারণগুলোর বিন্যাস

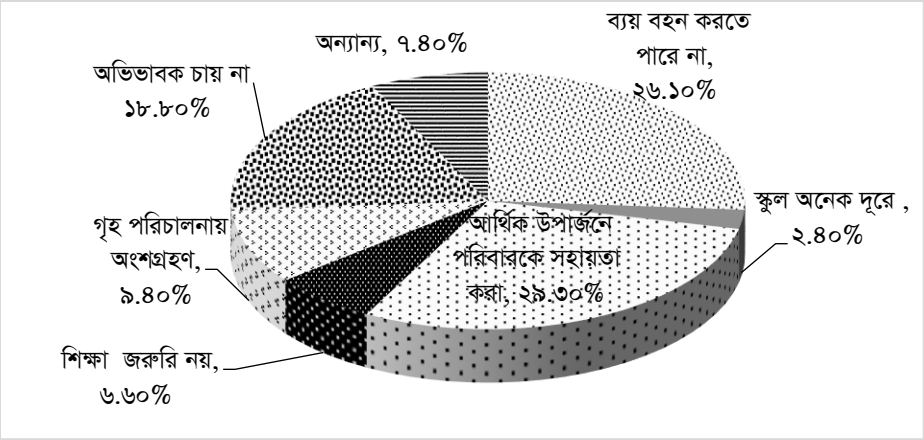

উৎস: Child Labor Survey, 2013.

শ্রমবাজারে শিশুদের যোগ দেয়া যদিও একটি অগ্রহণযোগ্য ঘটনা, কিন্তু জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব তাদেরকে শ্রমিক হতে বাধ্য করে। শিশুরা জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন পেশায় অংশ নিয়ে পরিবারের আয় সংকট উত্তরণ এবং অর্থনৈতিক ঝুঁকি কমানোর চেষ্টা করে। সেভ দ্যা চিলড্রেন (২০১৪) পরিচালিত গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, কর্মজীবী শিশুদের অধিকাংশই খুবই দুঃস্থ পরিবারের। হঠাৎ দুর্ঘটনা, পরিবারের কোনো সদস্যের অসুস্থতা এবং পিতা-মাতার বিবাহ-বিচ্ছেদ বা তাদের মধ্যে কারও মৃত্যুর কারণে এই পরিবারগুলোতে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। এ ধরনের চাপ বা সংকটের সময় পরিবারগুলো শিশুদের কাজে পাঠানোকেই সমাধান হিসেবে বেছে নেয়। যদিও দারিদ্র্যতা বাংলাদেশে শিশুশ্রমের মূল কারণ, তারপরও নিয়োগকর্তাদের কাছে শিশু শ্রমিকদের চাহিদা, শিশু শ্রমকে স্বাভাবিক বাস্তবতা হিসেবে মেনে নেয়ার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি শিশুশ্রম নিরসনের অন্যতম অন্তরায়। যেসব ঝুঁকিপূর্ণখাতে এখনও বিপুল সংখ্যক শিশুশ্রমিক নিয়োজিত আছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: (ক) ম্যানুফ্যাকচারিং বা শিল্প খাত (৩৩.৩ শতাংশ), (খ) কৃষি, বন এবং মৎস্য খাত (২৯.৯ শতাংশ), (গ) পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাত (১০.৬ শতাংশ) এবং (ঘ) নির্মাণ শিল্প খাত (৬.৯ শতাংশ) (Child Labour Survey 2013, P 62)।

কর্মজীবী শিশুদের মাসিক বেতন বা আয়ের জাতীয় গড়ের পরিমাণ অঞ্চলভেদে এবং বয়স অনুসারে ভিন্ন হয়। যেমন– গ্রামীণ এলাকায় একজন শিশু কাজ করে গড়ে মাসে ৫,৫০১ টাকা উপার্জন করে, শহর এলাকায় মাসিক বেতনের গড় ৬,০৬৭ টাকা এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সর্বোচ্চ ৬,৯৫২ টাকা উপার্জন করা সম্ভব। সর্বশেষ জাতীয় পারিবারিক আয়-ব্যয় জরিপ অনুসারে (HIES 2016) বাংলাদেশে একটি গ্রামীণ পরিবারের মাসিক গড় আয় হয় ১৩,৯৯৮ টাকা এবং শহরের একটি পরিবারের গড় আয় ২২,৬০০ টাকা (ডিসেম্বর ২০১৬ মাসে প্রাপ্ত তথ্য থেকে)।[৬] সুতরাং গ্রামাঞ্চলের একজন কর্মজীবী শিশু

[৬]https://www.ceicdata.com/en/bangladesh/household-income-and-expenditure-survey-household-income-per-month/hies-household-income-per-month.

পারিবারিক উপার্জনের প্রায় ৪০ ভাগ এবং শহরাঞ্চলের একজন কর্মজীবী শিশু পারিবারিক উপার্জনের এক-তৃতীয়াংশে অবদান রাখতে পারে। আরও অন্যান্য যেসব কারণে শিশুরা উপার্জনমুখী কাজে যোগ দিতে বাধ্য হয় (pull factors) তা হল বাবা-মায়ের ন্যূনতম আয়ের অনিশ্চয়তা, পরিবারের প্রাপ্তবয়স্কদের বেকারত্ব, পারিবারিক ঋণ পরিশোধের দায় এবং শিশুদের নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগাড় করা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শুধুমাত্র অভাব বা অর্থনৈতিক দুর্যোগ নয়, সেই সাথে শ্রমবাজারে শিশুদের চাহিদা এবং গরীব অভিভাবকদের শিশুদের উপার্জনের উপর নির্ভর করার প্রবণতাও শিশুশ্রম বজায় রাখার অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। সরকার যদি তার সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ঝুঁকি ও অভাবে আক্রান্ত পরিবারগুলোকে সঠিক সময়ে সহায়তা দিতে পারে এবং এসব পরিবারের শিশুদের স্কুলে ধরে রাখতে পারে তবে অনেক শিশুই ভবিষ্যতে আরও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে উঠার সুযোগ পাবে।

৪। শিশুশ্রম নিরসনে গৃহীত আইন এবং শিশু সুরক্ষার জন্য গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ

৪.১। বাংলাদেশে শিশুশ্রম হ্রাসের জন্য বিদ্যমান নীতি এবং প্রবিধানসমূহ

বাংলাদেশে শিশু শ্রম মোকাবেলার জন্য সরকারের বহু নীতি ও বিধি বিদ্যমান রয়েছে। সেগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:

সারণি ২: শিশুশ্রম সমস্যা মোকাবেলার জন্য গৃহীত রাষ্ট্রীয় নীতি ও আইন[৭]

নীতিসমূহ	বিবরণ
১। জাতীয় শিশুশ্রম নির্মূল নীতি ২০১০	এই নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো শিশুদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুনির্দিষ্ট কাজের ধরন এবং কর্ম পরিবেশ, বিনোদন, চিকিৎসা ও সুরক্ষার জন্য একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা। সেইসাথে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নিয়োগকর্তাদের দ্বারা শিশু নির্যাতনের ঝুঁকিগুলো হ্রাস করার একটি সামাজিক কাঠামো প্রবর্তন করা।
২। জাতীয় শিশুশ্রম কর্মপরিকল্পনা (২০১২-২০১৬)	শিশুশ্রম হ্রাসের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে শিশুদের সুযোগ সৃষ্টি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নয়ন, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার শক্তিশালীকরণ এবং সেই সাথে শিশুশ্রম রোধ ও কর্মজীবী শিশুদের জন্য বিদ্যমান কর্মপরিবেশ সৃষ্টির জন্য কার্যকর কৌশল চিহ্নিত করা।
৩। গৃহকর্মী সুরক্ষা এবং কল্যাণ আইন	ঘরের কাজে নিয়োগ দেয়ার জন্য গৃহকর্মীর বয়স ন্যূনতম ১৪ বছর হতে হবে; তবে ১২-১৩ বছর বয়সী শিশুরাও পিতা-মাতার অনুমতি নিয়ে ঘরের কাজে নিযুক্ত হতে পারে, যদিও এই নীতি প্রয়োগযোগ্য নয়।
৪। মানব পাচার রোধে জাতীয় পরিকল্পনা কর্মসূচি (২০১৫-২০১৭)	মানব অধিকার লঙ্ঘণ এবং মানব পাচার প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মান এবং মানব পাচারের শিকার হওয়া মানুষদের সুরক্ষা; ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য আইনি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা এবং এসব দেখার জন্য একটি কার্যকর প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা এবং তা প্রতিবেদন আকারে দাখিল করা।

(চলমান সারণি ২)

[৭]এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য গৃহীত পদক্ষেপ বা নীতি ছিল যা শিশুশ্রম সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সমাধান করেছে বা শিশুশ্রমের উপর প্রভাব ফেলেছে।

নীতিসমূহ	বিবরণ
৫। জাতীয় শিক্ষা নীতি	সরকারের প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি, উচ্চতর ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাসহ প্রচলিত অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যও সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করা ।
৬। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)	এই পরিকল্পনায় গৃহকর্মী হিসেবে এবং ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় শিশুদের নিয়োগ বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শিশুদের সুরক্ষার জন্য নীতি প্রণয়ন, বিভিন্ন ধরনের শোষণ থেকে রক্ষার জন্য পথ-শিশুদের প্রতি সহায়তা প্রদান কর্মসূচি এবং সরকারের শিশু সুরক্ষায় নিয়োজিত বিভিন্ন বিভাগ ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কার্যকর সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণ। কর্মজীবী শিশুদের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি এবং গরীব পরিবারে সন্তানদের কর্মসংস্থান ও উপার্জন বৃদ্ধির সহায়তা প্রদানের জন্য বিভিন্ন লক্ষ এ পরিকল্পনার অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।
৭। অন্যান্য নীতি যা শিশুশ্রম হ্রাসে প্রভাব ফেলতে পারে।	বাংলাদেশে শ্রম আইন ২০০৬, পর্নোগ্রাফি, মাদক সরবরাহ বা অস্ত্র ব্যবসায় শিশুদের ব্যবহার করার বিপক্ষে ফৌজদারী আইন; নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১।

২০১৩ সালে প্রণীত নতুন শিশু আইন পূর্ববর্তী শিশু আইন ১৯৭৪ কে বাতিল করেছে; কারণ পূর্বের আইনটি শিশু অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘ কনভেনশন ১৯৮৯ এর সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। নতুন আইনের ৪ নম্বর ধারায় বলা আছে যে, অন্য কোনো বিদ্যমান আইন বলবৎ থাকলেও ১৮ বছর বয়সের কম যে কোনো ব্যক্তিকেই শিশু হিসেবে গণ্য করা হবে। যদিও শিশু শ্রমকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার কোনো নির্দিষ্ট বিধান এতে নেই, তবে এটি শিশুদের বিরুদ্ধে কিছু গুরুতর অপরাধ নিষিদ্ধ করে এবং শাস্তিরও বিধান লিপিবদ্ধ করে। ২০১৩ সালে প্রণীত শ্রম আইনের তৃতীয় অধ্যায়েও শিশু-কিশোরদের কাজে নিয়োগের উপর কিছু বিধিনিষেধ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ আইনে অনানুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত শিশুদের রক্ষার জন্য কোনো নির্দেশনার উল্লেখ নেই। প্রদত্ত তথ্য হতে লক্ষণীয় যে, শিশুশ্রম নিরসনের জন্য সরাসরি নীতি ছাড়াও শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দিয়ে শিশুদেরকে দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তারপরও দেশে ১৭ লাখ শিশু শ্রমিক বিদ্যমান থাকার প্রেক্ষিতে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, নীতি বাস্তবায়নে এখনও যথেষ্ট মনোযোগ দরকার। তাছাড়া শিশুশ্রমের ব্যাপ্তি বর্তমানে কত তা বোঝার জন্য আবারও একটি শিশুশ্রম জরিপ হওয়া উচিত।

৪.২। শিশুশ্রম মোকাবেলার জন্য বিশেষ কার্যক্রম

বাংলাদেশে স্কুলে যাওয়া বয়সী শিশুরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকির মুখোমুখি হয় যেমন–স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ না পাওয়া, অপুষ্টি, অভিবাসন বা মৃত্যুর কারণে বাবা-মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়া ইত্যাদি (Kidd *et al.* 2017)। বাংলাদেশের প্রায় ৪৭ শতাংশ পরিবারে ৫-১৮ বছর বয়সী শিশু রয়েছে। হাসানের (2017) গবেষণায় দেখা যায় যে, সহিংসতার কারণে অনাথ হয়ে যাওয়া এবং একারণে পিতামাতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের সম্মুখীন হওয়া, স্কুল থেকে ঝরে পড়া এবং জীবিকার তাগিদে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিশুশ্রমিকে পরিণত হওয়া একটি সাধারণ প্রবণতা। এছাড়াও দেখা যায় যে, কিছুটা বড় বা কিশোর বয়সের শিশুদের মধ্যে শিশু শ্রমিকের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি। তাই অতি দরিদ্র পরিবারের স্কুল বয়সী শিশুদের "সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির" আওতায় নিয়ে আসা উচিত।

একারণেই বাংলাদেশের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS)-এর অধীনে স্কুল বয়সী শিশুদের সুরক্ষার মূল কৌশল হলো, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে অধ্যয়নরত শিশুদের বৃত্তির ব্যবস্থা করা এবং দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারে বসবাসরত শিশুদের সহায়তার ব্যবস্থা করা। শিশুদের জন্য স্কুলে খাওয়ানোর কর্মসূচি[৮] এবং প্রতিবন্ধী ভাতা চালু করা (যদি কোনো শিশুর মানসিক বা শারীরিক অক্ষমতা থাকে) এবং পরিত্যক্ত শিশুরা পিতামাতার কাছ থেকে যাতে আর্থিক সহায়তা পায়, তার আইনি বিধান জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল-এ রয়েছে।[৯]

সারণি ৩: শিশুশ্রম নির্মূলে গৃহীত কতিপয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

কর্মসূচি	বর্ণনা
১। শহরে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত ও অবহেলিত শিশুদের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসনে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির উদ্যোগ	ইউনিসেফ (UNICEF), সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় (MSW), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MoWCA) এর অধীনে এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৫ লাখ শিশু এবং ৩০,০০০ কিশোর-কিশোরী শর্তসাপেক্ষে নগদ অর্থ প্রদান, কাজের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া এবং সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের কাছে এসব সেবার খবর প্রচার করার উদ্যোগ আছে যার মাধ্যমে শিশুরা সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আসবে।
২। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিশুদের জন্য বৃত্তি কর্মসূচি	প্রাথমিক বৃত্তি কর্মসূচি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বারা বাস্তবায়িত হয় এবং বৃত্তি দেয়া হয় প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ। মাধ্যমিক বৃত্তি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বারা যার আওতায় বৃত্তি দেয়া হয় প্রায় ১০ লাখ। যদিও এ কর্মসূচিগুলো সর্বজনীন নয় তবুও এর লক্ষ্য হল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া দরিদ্রতম শিশুদের লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে কল্যাণ সাধন।
৩। স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিশুদের পুর্নবাসন কর্মসূচির ২য় ধাপ (২০১২-২০১৭)	এ কর্মসূচির আওতায় বিশ্বব্যাংকের তহবিলের মাধ্যমে ঝরে পড়া শিশুদের জন্য একটি পুনর্বাসন কর্মসূচি রয়েছে।"আনন্দ স্কুল" নামে পরিচিত এসব স্কুল অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম, বৃত্তি, বিনামূল্যে বই এবং স্কুলের ইউনিফর্ম দেয়ার মাধ্যমে ঝরে পড়া শিশুদের মূলধারার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনার সুযোগ করে দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও সহায়তা দেয়া হয়। জুন ২০১৬ পর্যন্ত ২০,৪০০টি কেন্দ্রে প্রায় ৭ লাখ (৬,৯০,০০০) দরিদ্র শিশুদের এ বিদ্যালয়গুলোর মাধ্যমে লেখাপড়া করানো হয়েছে।
৪। শিশু সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প (২০১২-২০১৬)	এ প্রকল্পটির মাধ্যমে অপব্যবহার, সহিংসতা ও শোষণের হাত থেকে শিশুদের সুরক্ষার জন্য সামাজিক কর্মসূচিকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার চেষ্টা করা হয়েছে– এর মাধ্যমে দেড় বছরের জন্য প্রতি মাসে ২৬ ডলার নগদ টাকা দেয়ার মাধ্যমে শিশুশ্রম কমানো এবং ঝরে পড়া শিশুদের বৃত্তি প্রদান কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।

(চলমান সারণি ৩)

[৮]স্কুলে খাওয়ানোর কর্মসূচিস্কুলে শিশু ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়ার হার কমে যাওয়ার একটি অন্যতম কারণ। বর্তমানে ১০৪টি উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৩৩.৯ লাখ শিক্ষার্থী দিনে ৭৫ গ্রাম পুষ্টি বিস্কুট/কুকিজ গ্রহণ করে।

[৯]জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল-২০১৫ অনুসারে একজন অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠা অসংখ্য শিশু রয়েছে, যেখানে অন্য অভিভাবক সন্তানের দায়িত্ব নিতে চান না। এই ধরনের একক পিতা বা মাতা দ্বারা পরিচালিত পরিবারে দারিদ্র্যের ঝুঁকি বেশি থাকে, শিশুর যত্ন বা দেখভালের জন্য তারা উপযুক্ত কাজের সন্ধানে যেতে পারে না। অথচ বাবা-মা উভয়েরই তাদের সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব নেয়া উচিত, এমনকি তারা একত্রে বসবাস না করলেও। এ ব্যাপারে একটি আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে যাতে পিতা-মাতা উভয়ে সন্তানের দায়িত্ব পালন করবেন।

কর্মসূচি	বর্ণনা
৫। শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় পরিবেশ সৃষ্টি	ইউনিসেফ সমর্থিত মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়ের (MoWCA) অধীনে পরিচালিত এ কর্মসূচির মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে জড়িত পথশিশুদের কাজ থেকে প্রত্যাহার করে স্কুলে তালিকাভুক্ত করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। ২০ জেলায় প্রায় ১৬,০০০ শিশুকে নগদ টাকা প্রদানের মাধ্যমে এ কর্মসূচি চালু করা হয়েছিল। এই প্রকল্পটি Country Level Engagement and Assistance to Reduce (CLEAR) Child Labor Project নামে পরিচিত।
৬। শিশু সাহায্য নাম্বার ১০৯৮	এই জরুরি টেলিফোন লাইনটি সহিংসতা, অপব্যবহার ও শোষণের শিকার শিশুদের দ্রুত সাহায্যের জন্য এবং সামাজিক সুরক্ষা নিয়ে আসার জন্য স্থাপন করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এবং ইউনিসেফ এর আর্থিক সহায়তায় নির্মিত এ সেবাটি ২০১৬ সালে দেশব্যাপি প্রসারিত হয়।
৭। শিশুদের স্কুলে খাওয়ানো/ফিডিং কর্মসূচি	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ২৫ লাখ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশুদের স্কুলে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা হয়।
৮। বিপজ্জনক শিশুশ্রম নির্মূলকরণের চতুর্থ ধাপ (২০১৮-২০২১)	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৩ মিলিয়ন ডলারের তিন বছরের প্রকল্প এটি। এর আওতায় প্রায় ১ লাখ শিশু শ্রমিক চিহ্নিত করা, এই শিশুদের ভোকেশনাল স্কুলে পুনরায় ভর্তি করা এবং তাদের পিতামাতার জন্য জীবিকা নির্বাহের সহায়তা দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।
৯। অন্যান্য কর্মসূচি	পথশিশু পুনর্বাসন কর্মসূচি, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের জন্য সহায়তা বৃদ্ধি, শিশু বিকাশ কেন্দ্র তৈরি এবং বাংলাদেশে শিশুশ্রম নির্মূলকরণ।

সারণি ৩ এর আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে শিশুশ্রম নির্মূলে গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের কেন্দ্রীয় কার্যক্রম মূলত শিশুদের স্কুলে রাখার মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বাড়ানো, সেই সাথে ধীরে ধীরে শিশুদের সুরক্ষার জন্য সরকারি প্রকল্প গ্রহণ এবং সচেতনতা তৈরি করার মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০১৫ সালে গৃহীত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল শিশুদের প্রয়োজনকে আলাদাভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ এ দলিলে শিশুদের প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে গৃহীত নানা কর্মসূচি প্রাধান্য পেয়েছে। তবে শিশুশ্রমের ব্যাপকতার তুলনায় এই প্রকল্পগুলো যথেষ্ট নয়। তাছাড়া প্রতি বছরই নতুন শিশু যুক্ত হচ্ছে শ্রম বাজারে আবার শিশু থেকে যৌবনে পদার্পণ করছে অনেকে, তারা আর শিশু শ্রমিক হিসেবে গণ্য হবার কথা নয়। কিন্তু ২০১৩ এর পর আর শিশুশ্রম জরিপ না হওয়ায় এর কোনো সঠিক হিসাব নেই। এই হিসাব থাকলে বোঝা যেত যে, শিশুশ্রম নিরসনে গৃহীত প্রকল্পগুলো কতটা কার্যকর হয়েছে।

এছাড়াও উপরে উল্লেখিত কর্মসূচিগুলোর বর্ণনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ সরকার সকল ধরনের শিশুশ্রম বিশেষ করে বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের নিয়োগ প্রতিরোধ করা, হ্রাস করা এবং তা থেকে সুরক্ষা করার বিভিন্ন উদ্যোগ ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছে। সরকার কর্তৃকও এটি স্বীকৃত যে, শিশুশ্রম বহুপক্ষীয় সমস্যা এবং এটির সমাধান সকলে মিলে করা উচিত। বর্তমানে বিদ্যমান শিশুশ্রম হ্রাস বা শিশু সুরক্ষা কর্মসূচিগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষা বা প্রশিক্ষণভিত্তিক এবং পুনর্বাসনমূলক। এ কর্মসূচিগুলো শুধু দৃশ্যমান সামাজিক সমস্যাগুলোর মোকাবেলা করে। যেহেতু শিশুশ্রমের সাথে জড়িত অনেক সমস্যাই দারিদ্র্যতা ও বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে নিহিত; তাই এটি প্রতিরোধে

দারিদ্র্য বিমোচন এবং আয়-বৈষম্য নিরসনের উপায় বের করা দরকার। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা বা নিরাপত্তা কর্মসূচি শিশুদের উপর কেমন প্রভাব রাখে তা পরবর্তী অনুচ্ছেদে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৪.৩। শিশুদের জন্য পরিচালিত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির প্রভাব

সামাজিক সুরক্ষা বা নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় শিশুদের জন্য পরিচালিত নানা কর্মসূচির ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি, শিক্ষায় অংশগ্রহণ, শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া কমানো ইত্যাদিতে।

ক) পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব

স্কুলে খাওয়ানোর কর্মসূচির ইতিবাচক প্রভাব পাওয়া গেছে শিক্ষার্থীদের পুষ্টির উপর (Ahmed 2005)। এ কর্মসূচির আওতায় সরবরাহকৃত পুষ্টিকর বিস্কুট-এর দ্বারা ছেলে ও মেয়ে শিশুদের পুষ্টি চাহিদার যথাক্রমে ২৩ শতাংশ ও ২৫.৪ শতাংশ পূরণ হয় (WFP 2018)। বর্তমানে ১০৪টি উপজেলার ৩৩.৯০ লাখ প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন ৭৫ গ্রাম পরিমাণে পুষ্টিকর বিস্কুট দেয়া হচ্ছে।

খ) শিক্ষায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃত্তি প্রকল্প শিশুদের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করে। সরকার ২০১৫ সালের জুলাই মাস থেকে প্রায় ৩০৬৭.৩৮ কোটি টাকা বৃত্তি ব্যবস্থা চালু করেছে যেন কোনো শিশুই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাইরে না থাকে। এ বৃত্তিভোগীর সংখ্যা ৭৯ লাখ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে (২০১৭-১৮) এখন প্রায় ১.৩০ কোটিতে পৌঁছেছে। এভাবে এ কর্মসূচি শিক্ষায় শিশুর অংশগ্রহণ বাড়িয়েছে। আবার উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ের বৃত্তি প্রকল্পের অধীনে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত প্রায় ৪০ ভাগ নারী শিক্ষার্থী এবং ১০ ভাগ পুরুষ শিক্ষার্থীকে বই কেনা, কলেজের ফরম পূরণ ও কলেজের বেতন প্রদানের জন্য বৃত্তি দেয়া হচ্ছে। এ শ্রেণির অনেকেই শিশু পর্যায়ে পড়ে। সুবিধাভোগীদের মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বৃত্তির টাকা সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মোবাইল নাম্বারে সরাসরি বৃত্তির টাকা পৌঁছে যায়, যার কারণে বৃত্তি সংগ্রহে যাতায়াতের অর্থ, ব্যাংক বা অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা তোলা ও সময় এ দুইটির-ই অপব্যয় ও অপব্যবহার ঠেকানো সম্ভব হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজন অনুসারে মোবাইল ব্যাংকে যেমস টাকা জমাও রাখতে পারে তেমন খরচও করতে পারে।

গ) বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া কমানো

ঝরে পড়া শিশুদের পুনর্বাসন কর্মসূচি (ROSC) শিশুদের শিক্ষায় ফিরিয়ে আনতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। ১২৫টি উপজেলার প্রায় ৩,১০,৯৮৭ জন শিক্ষার্থী যারা আগে কখনই স্কুলে যায়নি অথবা স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে তারা "আনন্দ বিদ্যালয়ের" মাধ্যমে পুনরায় লেখাপড়া শিখে আবার মূল/আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারায় ফেরত আসার একটি সুযোগ পেয়েছে। ৬৪ জেলা এবং ৮৬টি উপজেলায় ৯টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে এবং ২০৫টি বিদ্যালয়ের অধীনে প্রায় ২৮ হাজার ৫০০ জন হতদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু শিক্ষিত হওয়া এবং দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছে। আবার স্কুলে খাওয়ানোর কর্মসূচি যেসব স্কুলে আছে, সেখানে শিশুরা কম অনুপস্থিত থাকে এবং তাদের ঝরে পড়ার হারও কম। আহমেদ (২০০৪) এর মতে, স্কুলে খাওয়ানোর কর্মসূচির প্রভাবে শিশু ঝরে পড়ার হার শতকরা ৭.৫ ভাগ কমে।

ঘ) ঝুঁকিপূর্ণ/বিপজ্জনক শিশুশ্রম নিরসনঃ

ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম নিরসনে সরকারের যে প্রকল্প রয়েছে তার আওতায় প্রায় ৫০,০০০ শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে রক্ষা করা হয়েছে এবং প্রকল্পটির তৃতীয় পর্যায়ের মাধ্যমে এ শিশুদের অনানুষ্ঠানিক ও কারিগরি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। প্রকল্পটির চতুর্থ পর্যায়ে প্রতিটি শিশুকে মাসে প্রায় ১০০ টাকা অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তবে এ প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের উল্লেখিত কর্মজীবী শিশুদের মাসিক গড় মজুরি প্রায় ৬,১৭০ টাকার তুলনায় এই নগদ অর্থ নিতান্তই অপ্রতুল।

শিশুশ্রম পর্যবেক্ষণকে শক্তিশালী করার জন্য "কারখানা প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষণ অধিদপ্তরের" জনশক্তি ৯৯৩ জনে উন্নীত করা হয়েছে। সেই সাথে রাজস্ব বাজেটের আওতায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে "শিশুশ্রম পর্যবেক্ষণ" শাখা খোলা হয়েছে। শিশু শ্রমিকদের জন্য কর্পোরেট সোশ্যাল রিসপনসিবিলিটি বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচির আওতায় আনার জন্য একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিশুশ্রম নিরসনে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত দুঃস্থ মা এবং ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের নগদ সহায়তা প্রদান প্রকল্প বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

দুঃস্থ মায়ের সন্তানদের যাতে উপার্জনে নিয়োজিত না হতে হয়, সেজন্য এ কর্মসূচি ভূমিকা রাখছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৮ সাল নাগাদ-

- প্রায় ১০ লাখ (৯ লাখ ৭৪ হাজার) নারীকে গত তিন বছরে মাতৃত্ব ভাতা প্রদান করা হয়েছে;
- ল্যাকটেটিং মাদার ভাতা বা যেসব মায়েরা এখনও বাচ্চাদের দুধ খাওয়াচ্ছে সেরকম ৪ লাখ ৪০ হাজার কর্মজীবি নারীকে ভাতা দেয়া হয়েছে;
- ৯৩টি শিশু দিবা-যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে ১০ হাজার ৬৯০ জন শিশুর নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- ২০টি জেলার প্রায় ৯০ হাজার বঞ্চিত শিশু-কিশোরদের প্রতি মাসে ২,০০০ টাকা নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;
- সারা দেশে ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের (আজিমপুর, কেরানীগঞ্জ, গাজীপুর, খুলনা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী) মাধ্যমে প্রায় ৭৫০ জন দরিদ্র ও অসহায় শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাদের সামাজিক সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা বোঝা যায় যে, দরিদ্রতা নিরসন করার জন্য পরিচালিত কর্মসূচিগুলো যদি গরীব পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি, দুর্ঘটনা এবং বঞ্চনার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার ক্ষমতা সৃষ্টি করতে পারে তবে তা শিশুশ্রম কমাতে ভূমিকা রাখবে। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য (FFE) কর্মসূচির মূল্যায়ন করে দেখা গেছে যে, প্রতি খানার জন্য এক বছরে ১০০ কেজি চাল সরবরাহের ব্যবস্থা করলে ছেলে শিশুশ্রমের ঘটনা প্রায় ০.০৪ শতাংশ এবং মেয়ে শিশুশ্রমের ঘটনা ০.০২ শতাংশ কমে আসে (Ravallion and Wodon 2000)।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য নগদ অর্থ প্রদানের যে কর্মসূচিগুলি রয়েছে (ভিজিডি, ভিজিএফ ইত্যাদি) সেগুলোর সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার নির্বাচিত করার সময় যেসব পরিবারে শিশু শ্রমিক আছে তাদের প্রাধান্য দিলে, এ সমস্ত কর্মসূচির মাধ্যমেও শিশুশ্রম রোধ করা সম্ভব। অতএব যেসব পরিবারে ১৫ বছরের কম বয়সী শিশু রয়েছে তারা এ কর্মসূচিগুলোতে অগ্রাধিকার পেতে পারে। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে দরিদ্র পিতামাতাদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য "পারিবারিক উন্নয়ন সংক্রান্ত" বিষয়ে আলোচনা সভা বা মতবিনিময় সভা চালু করে শিশুদের জন্য উপযোগী কাজ এবং অনুপোযোগী কাজগুলোর পার্থক্য তুলে ধরা যেতে পারে (Bollig 2015)। তবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিদ্যমান সুশাসনের অভাব যদি চলতেই থাকে তাহলে সুফল আসবে না।

৪.৪। শিশু সুরক্ষাকে ফোকাস করে প্রণীত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর অর্থায়ন

শিশু অধিকার বা শিশু নিরাপত্তাকে কেন্দ্র/ফোকাস করে প্রণীত সামাজিক কর্মসূচিগুলোর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ তালিকাসহ নিচের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৪: শিশুশ্রম বা শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোতে বরাদ্দকৃত বাজেট

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর অধীনে গৃহীত কার্যাবলী	বাজেট (মিলিয়ন ডলারে)							বর্তমান সুবিধাভোগীর সংখ্যা
	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	
১ পথশিক্ষণ পুনর্বাসন কার্যক্রম	-	-	০	২০	৩২	৩৫	৪০	২০১৮-১৯ অর্থবছরে ০.০২ সুবিধাভোগী/প্রতিমাস (শ্রম মাস)
২ শিশু অধিকার নিশ্চিতে পরিবেশগত কাঠামো উন্নয়ন		৬০৬	৪০০	২৩৪	২১৯	০	০	কার্যক্রম চালু নেই।
৩ বিপদগামী শিশুদের জন্য সেবামূলক কর্মকাণ্ড		১০৭	২৭৭	২২১	০.১	০	০	কার্যক্রম চালু নেই।
৪ বাংলাদেশে শিশু সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা	১৩১	১৬১	২০১	১২১৩	৭২.৫	০	০	কার্যক্রম চালু নেই।
৫ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র	৩০	৩২	৪৫	৪৫	৪৮	৫৩	৫৮	২০১৮-১৯ অর্থবছরে ০.০৩ সুবিধাভোগী/প্রতি মাসে (শ্রম মাস)। এই ৬টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৭৫০ জন দরিদ্র ও অসহায় শিশুদের পুরো সামাজিক সুবিধা দেয়া হয়েছে।

(চলমান সারণি ৪)

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর অধীনে গৃহীত কার্যাবলী	বাজেট (মিলিয়ন ডলারে)							বর্তমান সুবিধাভোগীর সংখ্যা
	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	
৬ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি	৯২৫০	৮৫২৫	৯৪০০	১৪০০০	১৪০০০	১৪৫০০	১৫৫০০	২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১ কোটি ৪৩ লাখ শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে।
৭ বিদ্যালয়ে খাদ্য প্রদান কর্মসূচি	৪৫৬৫	৫১৫৫	৪৫৪৮	৫০৭৮	৫৪০১	৪৮৪২	৬৭১০	প্রতিটি বিদ্যালয়ে দিনে প্রায় ২৫ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭৫ গ্রাম কুকিজ/বিস্কুট বিতরণ করা হচ্ছে। (২০১৭-১৮ অর্থবছরে এর ব্যাপ্তি/কভারেজ ছিল প্রায় ৩৫ লাখ)
৮ বহিরাগত শিশুদের স্কুলমুখী করা	৬৯৫.৮	১৪৮০	১৬৫৫	১৪৭৬	১৬৫০	২২৪০	২২৯১	২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫.৬ লাখ সুবিধাভোগী। এই কর্মসূচির আওতায় ১৩৫টি উপজেলার ৩.১ লাখ শিশু ১১,১৬২টি আনন্দ স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল।
৯ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিনিয়োগ কার্যক্রম	-	৪০০	১৫৯৪	৩০১৮	৫৭১৩	৭৬১০	৬০০০	২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৮.৮ লাখ সুবিধাভোগী। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাধ্যমিক স্তরে ১০,০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সরবরাহের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
১০ মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি		২৭৩০	২১৮৫.৮	২৪৫০	২৩৩৬	২৮৫৫	২০০০	২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮.৩ লাখ সুবিধাভোগী। যেখানে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট উপকারভোগী ছিল ১৭.২ লাখ।

উৎস: Budget Documents from Ministry of Finance and Child Budget FY2018-19।

সারণি ৪ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শিশুদের জন্য স্কুলভিত্তিক কিছু কর্মসূচি ছাড়া অন্যান্য কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ খুবই সীমিত। কিছু কর্মসূচির সময়সীমা ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। মন্ত্রণালয় অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ থেকে দেখা যায় যে, শিশুশ্রম বন্ধের সাথে সম্পর্কিত বেশির ভাগ কর্মসূচিই শিক্ষা সম্পর্কিত এবং

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়েছে। ভবিষ্যতে একটি দক্ষ শ্রমশক্তি এবং যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য এ বিনিয়োগ পর্যায়ক্রমে অনুমোদিত বরাদ্দের যে পুরোপুরি সদ্ব্যবহার হয় তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়গুলোর ভূমিকা থাকতে হবে।

সারণি ৫: মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শিশু সম্পর্কিত বাজেট বরাদ্দ শতকরা অংশ হিসেবে (নির্বাচিত ১৫টি মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের বাজেট বরাদ্দ অনুসারে)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮
১। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৯৯.৫১%	৯৯.৩১%
২। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৭৮.০৬%	৭২.৯১%
৩। প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	৭১.১৬%	৬৬.৭৭%
৪। মেডিক্যাল শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	৪১.০৫%	৩৯.০৮%
৫। স্বাস্থ্য পরিসেবা বিভাগ	৪৩.১১%	৩৮.৮৯%
৬। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩৯.৬৮%	৩৫.৮৭%
৭। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৩০.৬০%	২৭.৯২%
৮। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	২৫.১৭%	২১.৫৬%
৯। স্থানীয় সরকার বিভাগ	৮.৮৪%	৬.৬৬%
১০। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৮.৮৬%	৬.৪৬%
১১। জনসুরক্ষা বিভাগ	১১.৩৪%	২.৮৫%
১২। তথ্য মন্ত্রণালয়	৫.২০%	০.৮৭%
১৩। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৯.৯৯%	৫.০৪%
১৪। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১১.৪০%	১.৬৬%
১৫। আইন ও বিচার বিভাগ	২.৬৮%	০.৭০%
মোট (১৫টি মন্ত্রণালয়)	৪৩.৫৬%	৪১.৪১%

উৎস: Child Focused Budget 2018-19, p.19.

সারণি ৫ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শিশুদের নিয়ে কর্মসূচি আছে এমন ১৫টি মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ সালের মোট বাজেটের ৪৩.৫৬ শতাংশ শিশুদের জন্য ব্যয় হয়েছে। এই বাজেট বরাদ্দের কত অংশ কেবল শিশুশ্রম নিরসনে ব্যয়ের জন্য তা আলাদা করে বলা মুশকিল। তবে শিশু বাজেট অনুযায়ী শিশুশ্রম থেকে সুরক্ষিত থাকার যে অধিকার শিশুদের রয়েছে সেটি রক্ষার দায়িত্ব মূলত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের। তাই শিশু বাজেট হতে শিশুশ্রম নিরসণের উদ্যোগ বুঝতে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচিগুলোর প্রতি মনোযোগ দেয়া যায়। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শিশুশ্রম নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ নিম্নরূপ –

- ২০১৫ সাল হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত বিষয়ে ১৮৮টি মামলা হয়েছে, যার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৫১টি;
- শিশুদের জন্য ৩৮টি কাজকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শিশুদের জন্য ঝঁকিপূর্ণ ৩৮টি খাতের মধ্যে ১১টি খাতকে (অ্যালুমিনিয়াম, তামাক/বিড়ি, সাবান, প্লাস্টিক,

কাঁচ, স্টোনক্রাসিং, স্পিনিং, সিল্ক, ট্যানারি, শীপব্রেকিং, তাঁত) শিশুশ্রম নিরসনে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের জন্য নতুন ১৭টি সেক্টর নির্ধারণ করা হয়েছে;

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে "ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩টি পর্যায়ে ৯০,০০০ হাজার শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে বের করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৪র্থ পর্যায়ে মোট ১ লাখ শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে বের করে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;

- শিশুশ্রমের কুফল সম্পর্কে শিশুর পিতামাতা, সাধারণ জনগণ ও সুশীল সমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সেক্টর ভিত্তিক/কারখানা ভিত্তিক মালিক কর্তৃপক্ষের সাথে উদ্বুদ্ধকরণ সভা/মতবিনিময় সভা এবং স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা হচ্ছে। এছাড়া প্রয়োজনে আইনানুগ নোটিশ প্রদান ও শ্রম আদালতে মামলা করা হচ্ছে;

- ২০০৯ সালে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে "শিশুশ্রম শাখা" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটি দেশের শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক সকল নীতি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে;

- শিশুশ্রম মনিটরিং করার লক্ষ্যে কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল ৯৯৩-তে উন্নীত করা হয়েছে;

- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত সারাদেশে বিভিন্ন কারখানা প্রতিষ্ঠানে ৭৬৫টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে;

- রাজস্ব বাজেটের আওতায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রম উইং এর তত্ত্বাবধানে একটি শিশুশ্রম শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৫। বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোকে কাজে লাগিয়ে শিশুশ্রম পুরোপুরি নির্মূল করার জন্য ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা

৫.১। শিশুশ্রম মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচিগুলোর সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ ও দূর করার উপায় খোঁজা

বর্তমান গবেষণার আওতায় শিশুদের অধিকার ও কল্যাণে নিয়োজিত সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের উচ্চপদে কর্মকর্তা, উন্নয়ন অংশীদারে নিযুক্ত সংগঠনগুলোর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও স্থানীয় বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার থেকে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে শিশুশ্রম মোকাবেলার জন্য সবচেয়ে কার্যকর কৌশল সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। এসব সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত পরামর্শের বার্তা হলো, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোকে শিশুশ্রম নির্মূলের জন্য আরও উপযোগী করে তোলা। সারণি ৬- এ সাক্ষাৎকারগুলো থেকে প্রাপ্ত মূল পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হলো-

সারণি ৬: শিশুশ্রম নিয়ে কাজ করে এমন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত মূল পর্যবেক্ষণ

সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী	শিশুশ্রম সম্পর্কিত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য	শিশুশ্রম নিরসনে গৃহীত কৌশল
১। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (MoLE) এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MoWCA)	১। বিপজ্জনক ধরনের শিশুশ্রম বিলোপ এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের নিয়োগ এবং ব্যবহারের বিরুদ্ধে কার্যকর ও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ ২। ২০২৫ সালের মধ্যে সব ধরনের শিশুশ্রম নির্মূলকরণ	১। বিদ্যমান নীতি এবং শিশুশ্রম সম্পর্কিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন। উদাহরণস্বরূপ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো তাদের মাসিক কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন সভাগুলোতো শিশুভিত্তিক কর্মসূচিগুলোর অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে পারে। ২। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (MoLE) নিয়মিত বৈঠকের মাধ্যমে শিশুদের ঢালাওভাবে নিয়োগ করে এমন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও খাতগুলোকে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। ৩। এ মন্ত্রণালয় শিশুশ্রম মোকাবেলার জন্য তিনটি স্তরে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। i) প্রতিরোধ: প্রশিক্ষণ, গণ সচেতনতা সৃষ্টি, শিশু বান্ধব পরিবেশ তৈরি, স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি সক্রিয়করণ এবং অল্প বয়সে বিয়ের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো ইত্যাদি; ii) সুরক্ষা; এবং iii) পুনর্বাসন।
২। উন্নয়ন অংশীদারদের প্রতিনিধি	শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় জনমত তৈরি এবং শিশু শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের ক্ষমতায়ন।	১। বাংলাদেশে শিশুশ্রমের অবস্থার উন্নতির জন্য ৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রয়োজন। বিষয়গুলি হলো– শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, প্রচারণা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন। ২। মূল কৌশল হচ্ছে কর্মজীবী শিশুদের জন্য দ্রুত শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা, যোগাযোগের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কর্মসূচি উদ্ভাবন করা, বিশ্লেষণাত্মক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন আর্থিক সংস্থার সাথে কর্মজীবী শিশুদের সংযোগ স্থাপন করা। ৩। শিশুদের জন্য উপযুক্ত কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার নীতিগুলোর বিকাশ (বিপজ্জনক এবং অ-বিপজ্জনক শ্রম) এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ট্রেড ইউনিয়ন, বিজিএমইএ, বিকেএমইএসহ বিভিন্ন নিয়োগকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে শিশুশ্রম হ্রাসের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করা।

(চলমান সারণি ৬)

সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী	শিশুশ্রম সম্পর্কিত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য	শিশুশ্রম নিরসনে গৃহীত কৌশল
৩। জাতীয় পর্যায়ের এনজিও –প্রতিনিধি (১)	১। ২০২১ সালের মধ্যে সকল ধরনের বিপজ্জনক শিশুশ্রম দূর করা ২। এসডিজি ৮ নম্বর লক্ষ্যের ৮.৭ ধারা অর্জনের জন্য সকল ধরনের শিশুশ্রম নির্মূল করা।	১। বিপজ্জনক শিশুশ্রম অবস্থার উন্নতির জন্য ৪ ধরনের কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন। এই কৌশলগুলো হলো: প্রতিরোধ, সুরক্ষা, পুনর্বাসন এবং শিশু আইনের প্রচার ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা। দরিদ্রতা নিরসন এবং শিশু আইনের প্রচার ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা। দারিদ্রতা নিরসন এবং আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে শিশুশ্রম প্রতিরোধ করা যেতে পারে। শ্রম আইন বাস্তবায়নের পাশাপাশি স্কুল বৃত্তি এবং স্কুলে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিতে শিশুদের তালিকাভুক্ত করে শিশুশ্রম হতে সুরক্ষা বাড়ানো যেতে পারে। পরিত্যাক্ত এবং অতি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় অথবা সহিংসতার শিকার শিশুদের জন্য আশ্রয় ও খাদ্য সংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা যেতে পারে। ২। ৩টি পদক্ষেপের মাধ্যমে এ কৌশলগুলি বাস্তবায়ন সম্ভব: অনুদান প্রদান, ধারণক্ষমতা উন্নয়ন এবং শিশুবান্ধব নীতির প্রচার সাধন।
৪। জাতীয় পর্যায়ের এনজিও –প্রতিনিধি (২)	১। শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং অনানুষ্ঠানিক/অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের বিপজ্জনক শিশুশ্রম নিরসন করা। ২। শিশুশ্রম সম্পর্কে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়কে অবহিতকরণ এবং সংবেদনশীল মনোভাব তৈরি করা।	শিশুশ্রম নিরসনে এই প্রতিষ্ঠানের মূল কৌশলগুলি হলো- ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, শিশু সুরক্ষা আইনের প্রচার ও প্রসার ঘটানো, স্কুল থেকে শিশুদের ঝরে পড়া রোধ, শিশুদের দক্ষতা বিকাশ এবং মায়েদের সাথে আলোচনা করে শিশুশ্রম হ্রাসের জন্য জনমত গঠন করা।

পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সরকারি মন্ত্রণালয় ও তৎসংশ্লিষ্ট তৃণমূল সংস্থাগুলো বিপজ্জনক শিশু শ্রমের সাথে জড়িত শিশুদের পুনরুদ্ধার করা, দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শ্রমে নিযুক্ত হওয়া থেকে বিরত রাখা ও কর্মজীবী শিশুদের নির্দিষ্ট শ্রমঘণ্টার বেশি কাজ না করানোর জন্য নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার থেকে যে পরামর্শগুলো পাওয়া যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- শিশুদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, পিতামাতার মধ্যে শিশুশ্রম সম্পর্কিত সচেতনতা সৃষ্টি করা, গরিব পরিবারগুলোকে সহায়তা দেয়া যাতে তারা সন্তানদের উপার্জনের উপর নির্ভরশীল না হয় এবং শিশুশ্রম হ্রাসের জন্য বিদ্যমান আইন ও বিধিসমূহ বাস্তবায়ন করা।

৫.২। আগামীতে করণীয়

বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর সংখ্যা ও প্রসার ভালো হলেও সরাসরি শিশুশ্রম সমস্যা মোকাবেলার জন্য গৃহীত কর্মসূচি এখনও খুবই কম। প্রধানত স্কুল বৃত্তি এবং স্কুলে খাওয়ানোর কর্মসূচি, পুনর্বাসন ও নগদ অর্থ প্রদানের মধ্যেই- এ কর্মসূচিগুলোর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তবে স্কুলভিত্তিক কর্মসূচি ছাড়া অন্য কর্মসূচিগুলোর জন্য বরাদ্দ ও ব্যাপ্তি (Coverage) খুবই কম। শিশু শ্রমের সমস্যা বিবেচনায় রেখে যদি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করা হয়, তবে শিশুদের জন্য আরও বেশি কল্যাণকর হবে। এছাড়াও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করাও অত্যন্ত কঠিন, শুধুমাত্র তাদের নামের তালিকা এবং বরাদ্দকৃত বাজেট একই উৎস হতে পাওয়া সম্ভব। পরিকল্পনা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর বিস্তারিত তথ্য সমৃদ্ধ একটি ওয়েব পোর্টাল চালু করা উচিত যার মধ্যে উন্নয়ন সহযোগী ও এনজিওদেরও জড়িত করা যেতে পারে। বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি কর্মসূচি এবং বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে শিশুশ্রম নির্মূল করার প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো উপস্থাপন করা হলো।

৫.২.১। বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো সংস্কার করা

দরিদ্রতা ও শিশুশ্রমের মধ্যে সুদৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। দরিদ্র পরিবারের শিশুদের ভবিষ্যতে শিশু শ্রমিক হওয়ার সম্ভবনা বেশি। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো পরিকল্পনার সময় যে সমস্ত পরিবারে শিশু আছে সেসব পরিবারকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। স্কুলভিত্তিক কর্মসূচিগুলোতে শিশু শ্রমিক হিসেবে কাজ করে এমন শিশুদের জন্য বরাদ্দ বেশি রাখা উচিত। এর ফলে স্কুলে শিশুদের উপস্থিতির হার বাড়বে এবং শিশুশ্রমের প্রবণতা হ্রাস পাবে। কিন্তু এ কর্মসূচিগুলো ইতোমধ্যে স্কুলের বাইরে কর্মরত শিশুদের জীবনযাত্রা উন্নয়নের ক্ষেত্রে তেমন প্রভাব ফেলতে পারে না। বোলিগের (২০১৫) মতে, স্কুলে খাবার খাওয়ানো এবং খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিগুলো শিশুশ্রম হ্রাসের চেয়ে স্কুলে শিশুদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধির উপর বেশি প্রভাব ফেলে। তাই স্কুলে যাওয়ার সুযোগ বঞ্চিত শিশু ও পথশিশুদের পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য ভিজিডি ও ভিজিএফ এর মত কর্মসূচিগুলোকে পরিবার ও কমিউনিটিভিত্তিক কর্মসূচিতে রূপান্তর করা উচিত। নগদ ও বিবিধ ভাতা প্রদান কর্মসূচির আওতায় চলমান কার্যক্রম যেমন বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা, ওএমএস (OMS) খাদ্য কর্মসূচি, পরীক্ষামূলক ত্রাণ কর্মসূচি এমনভাবে পরিকল্পণা করা উচিত যে, ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের পরিবারগুলো এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিগুলোর সুবিধাভোগী নির্বাচনে সে পরিবারগুলোকেই অগ্রাধিকার দেয়া উচিত যেসব পরিবারে অভিভাবকের অবর্তমানে বৃদ্ধ/বৃদ্ধা তাদের নাতি/নাতনীদের দেখাশুনা করে। এ পরিবারগুলোকে কমিউনিটি ভিত্তিক টার্গেটিং -এর মাধ্যমে চিহ্নিত করা এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনা হলে মায়েরা বাইরে উপার্জনের সুযোগ পাবে এবং তাদের শিশুরা নিরাপদে পরিবারের বয়স্কদের তত্ত্বাবধানে থাকবে। এই একটি পদক্ষেপ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বহমান দারিদ্র্য চক্রকে অতিক্রম করতে সহায়তা করবে। এছাড়াও সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পিত নগদ ভাতা এবং অর্থ প্রদান কর্মসূচিগুলোর সাথে শিশুদের স্কুলে ধরে রাখার জন্য প্রণোদনা কর্মসূচি চালু করা উচিত। যেমন–স্কুলে অংশগ্রহণের সুবিধা নিশ্চিতকরণ, স্কুল পরবর্তী কার্যক্রম এবং স্বাস্থ্য সেবায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি শিশুশ্রম হ্রাসে অনেক বেশি প্রভাব ফেলতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের জন্য কর্মসংস্থানের উৎস সৃষ্টির

মাধ্যমে শিশু শ্রমের উপর পরিবারগুলোর নির্ভরতা কমানো যায়, বিশেষ করে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (EGP) এবং কাজের বিনিময়ে অর্থ (WFM) কর্মসূচি –এ ধরনের কর্মসূচিগুলোর উপর সরকারের বিশেষ মনোযোগ দেয়া উচিত।

এখানে উল্লেখ্য যে, শহর ও গ্রামীণ এলাকার দরিদ্রতার হারের তুলনামূলক পার্থক্য থেকে শহরের দরিদ্রদের চরম দুরাবস্থার চিত্র বোঝা সম্ভব নয়। কারণ শহরের জীবনযাত্রার ব্যয় গ্রামের চেয়ে অনেক বেশি। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, পানি, বিদ্যুৎ এবং পয়ঃনিষ্কাশনের অস্থিতিশীল সরবরাহ ব্যবস্থা শহুরে দরিদ্র পরিবার এবং শিশুদের জন্য একটি বড় উদ্বেগ। এ কারণেই শহরের বস্তি এলাকার জন্য সামাজিক কর্মসূচিগুলো পরিস্থিতির আলোকে বিশেষভাবে নেয়া দরকার।

৫.২.২। শিশুশ্রম এবং শিশু সুরক্ষার যাবতীয় তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ তৈরি করা

যেসমস্ত পরিবারে শিশু শ্রমিক রয়েছে, তাদের তথ্য নিয়ে একটি ডাটাবেজ তৈরি করা যা প্রতি ৫ বছর অন্তর হালনাগাদ করা উচিত। এর ফলে ঐ পরিবারগুলোর খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি শিশুদের উপার্জনে যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরি হবে।

৫.২.৩। শিশু বাজেট

শিশু বাজেটের মাধ্যমে আমরা শিশু কেন্দ্রিক বরাদ্দের পরিমাণ সম্পর্কে জানতে পারছি। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ বরাদ্দ ছিল জাতীয় বাজেটের ১৫.৩৩ শতাংশ। শিশু বাজেট সরাসরি অথবা সুনির্দিষ্টভাবে শিশুশ্রমকে উদ্দেশ্য করে কর্মসূচি প্রণয়ন করে না, তাই এ সমস্যাটির উপর বিশেষভাবে মনোযোগ নিবন্ধ করে বাজেটে নির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকা উচিত। এছাড়াও অঞ্চলভিত্তিক কর্মসূচিগুলো নিরীক্ষা করে শিশু বাজেট নিশ্চিত করবে একই কার্যক্রমে সরকার ও এনজিও উভয়ই বরাদ্দ করছে না। যেসব শিশুশ্রমিক পুনরায় স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করতে চায়, তাদের বিনামূল্যে পড়ার সুযোগ শিশু বাজেটে রাখা উচিত। এ কর্মসূচিতে ১৪ বছরের বেশি বয়সী স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত এবং তাদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। সেই সাথে পথশিশু, ঝুঁকিপূর্ণ শিশু এবং শিশু শ্রমিকদের অভিভাবকদের অন্তর্ভুক্ত করে বাজেটে বিশেষ ধরনের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ থাকতে হবে।

৫.২.৪। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন

বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিশুদের সংখ্যাও বাড়ছে। তাই শিশুশ্রম নির্মূলে গৃহীত কর্মসূচি এবং পরিকল্পনাগুলোতে ভবিষ্যত শিশু শ্রমের মাত্রা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্বপরিকল্পনা রাখা উচিত।

শুধুমাত্র বিদ্যমান শিশু শ্রমের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ রাখলে শিশুশ্রম নির্মূলের স্থায়ী সমাধান আসবে না। বর্তমান ও ভবিষ্যত শিশুদেরকে শিশুশ্রম থেকে রক্ষা করার কৌশল প্রণয়ন- এ সমস্যা নিরসনের সর্বোত্তম পন্থা। এক্ষেত্রে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক কার্যক্রমের তালিকা এবং বাস্তবায়নের মাত্রা আরও জোরদার করতে হবে। সেই সাথে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাঝেও শিশুশ্রম সম্পর্কিত বিষয়গুলি মোকাবেলায় অনীহা দেখা গেছে। তাই মন্ত্রণালয়গুলিতে শিশুশ্রম প্রতিরোধের নীতিগুলো জোরদার করা এবং জবাবদিহিতা জোরদারের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়কে শিশুশ্রম নিরসনে তাদের কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে শিশু

সম্পর্কিত তথ্য আলাদাভাবে তাদের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করতে পারে যা শিশুশ্রম নির্মূলের অগ্রগতি প্রদর্শন করবে।

৫.২.৫। তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সুস্পষ্ট কার্যকর নীতি তৈরি

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলো পারিবারিক বা খানাভিত্তিক বিস্তৃত জরিপ এবং প্রশাসনিক নথির ভিত্তিতে প্রণয়ন করা উচিত। নীতিগুলো শিশুশ্রমের ব্যাপকতা ও শিশুশ্রম প্রতিরোধে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের সমন্বয়ে গঠন করা উচিত। প্রতিবছর শিশু বাজেট প্রণয়নের সময় শিশুশ্রম সম্পর্কিত নিয়মিত তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি সামাজিক কর্মসূচিগুলোর পরিধি, কভারেজ ও কার্যকারিতা সম্পর্কিত তথ্যও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নত কর্মসূচি প্রণয়ন, বিভিন্ন কর্মসূচির প্রভাব, টার্গেটিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে সঠিক প্রাক্কলন বা ধারণা তৈরি হবে।

৫.২.৬। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কর্মদক্ষতা এবং জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সব ধরনের কর্মসূচির দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা উচিত। নগদ অর্থ বা সম্পদ হস্তান্তর কর্মসূচিগুলোর দক্ষতা ও টার্গেটিং বা লক্ষ্যমাত্রা পূরণ এবং অর্থ প্রদান কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বব্যাংক সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের কথা বিবেচনায় রেখে টার্গেটিং, কর্মসূচি চালানোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং নগদসহ বিভিন্ন ভাতার আধুনিকীকরণের জন্য সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সামাজিক সেবা (DSS) বিভাগের মাধ্যমে "নগদ অর্থ স্থানান্তর আধুনিকায়ন প্রকল্প" (Cash Transfer Modernization Project) চালু করেছে (World Bank 2018)। বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ৪টি প্রধান কর্মসূচির দক্ষতা ও স্বচ্ছতা উন্নয়ন করাই এ প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য। এর আওতায় ৪টি প্রধান কর্মসূচি হলো: বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম এবং অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা ও শিক্ষা। এ ধরনের যুগোপযোগী পদক্ষেপের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি শিশুশ্রম নির্মূলে আরও দক্ষ হয়ে উঠতে পারে।

৬। উপসংহার

বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমশই নানা প্রতিকূলতা মোকাবেলায় সুদক্ষ হয়ে উঠেছে, আয় বৃদ্ধির সাথে দেশের অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার শংকাও দূরীভূত হয়েছে অনেকখানি। বিগত কয়েক বছরের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং তা বজায় রাখার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই স্বল্প আয়ের দেশের তালিকা থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। সাথে সাথে নবজাতক ও শিশুমৃত্যু হার হ্রাস, টিকাদান কর্মসুচি, দারিদ্র্য বিমোচন, প্রাথমিক শিক্ষায় জেণ্ডার সমতা অর্জনের মাধ্যমে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনসহ বিভিন্ন সামাজিক খাতেও অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের যাত্রাপথে ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য মানব উন্নয়নে বিনিয়োগ হলো সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ, আর মানব উন্নয়নে বিনিয়োগের সর্বোত্তম ক্ষেত্র হচ্ছে শিশুদের উপর বিনিয়োগ। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে, দেশের ভবিষ্যৎ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উত্তম পন্থা হলো, শিশুদের ওপর কাঙ্খিত মাত্রায় সরকারি বিনিয়োগ নিশ্চিত করা (Heckman and Masterov 2007)।

বাংলাদেশ শিশুশ্রম নির্মূল নীতি ও কর্মপরিকল্পনা, শিশুশ্রম জরিপ ২০১৩, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ২০১৫ এবং শিশু বাজেটসহ সাম্প্রতিক জাতীয় নথিগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, শিশুশ্রমের বিষয়টি এই সবকটি দলিলেই উল্লেখযোগ্য মনোযোগ পেয়েছে। শিশুশ্রম পরিস্থিতির ব্যাপকতা এবং তীব্রতার কথা বিবেচনা করে সরকার বেশ কিছু কর্মসূচি নিয়েছে এবং বিপজ্জনক শিশুশ্রম পুরোপুরি নির্মূল করার জন্য আরও কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলের বৃত্তি কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল-এ শিশুশ্রমকে একটি বহুমাত্রিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, তাই শিশু-কিশোরসহ তাদের মা-বাবা এবং পরিবারের অন্যান্য প্রাপ্ত বয়স্কদের সঙ্গে নিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সমন্বয় করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে প্রচুর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রয়েছে যেগুলো দুর্বল বাস্তবায়ন ও পরিচালনা সমস্যায় ভোগে। তাই শিশুশ্রম সম্পর্কিত কর্মসূচিগুলোর নিয়মিত মূল্যায়ন, পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ এবং সেই সাথে শিশু সুরক্ষা ও শিশুশ্রমের সাথে সম্পর্কিত সব মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা উচিত। যেহেতু টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বাস্তবায়ন বর্তমান সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিটি মন্ত্রণালয়েরই এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে, তাই শিশুশ্রম নির্মূলকে এই প্ল্যাটফর্মের অংশ হিসেবে বিবেচনা করলে দ্রুত ও কার্যকর ফলাফল লাভ করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশে শিশুর সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ৬০ লাখ যা, বিদ্যমান জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ। এ শিশুদেরকে সমতা ও বৈষম্যহীন পরিবেশে যোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে তোলার মাধ্যমেই আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন টেকসই হবে। শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মননশীলতার বিকাশে প্রকৃত মনোযোগ না দিলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল বাস্তবায়ন ও সুশাসন সম্পর্কিত সমস্যায় জর্জরিত হওয়ায় নিয়মিত শিশুভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মূল্যায়ন প্রয়োজনীয়। এজন্য যেমন আরও অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন, তেমনি দরকার শিশুদের কল্যাণে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজ, বিভিন্ন শিশু সংগঠন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও) এর সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং নীতি নির্ধারকদের কাজের সমন্বয়। শিশুশ্রমের অবসান, মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ, সহিংসতা ও নির্যাতনসহ বিভিন্ন ঝুঁকির মধ্যে থাকা শিশুদের উদ্ধার শুধুমাত্র সরকার বা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য নয় বরং সকল শ্রেণি ও বয়সের শিশুদের প্রতি সামাজিক রীতিনীতির এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও এক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থপঞ্জি

Ahmed, A. U. (2005): "Impact of Feeding Children in School: Evidence from Bangladesh," Project paper, International Food Policy Research Institute (IFPRI).

Amélia, B., and M. Carla (2009): "Child Poverty: A Multidimensional Measurement," *International Journal of Social Economics*, Vol. 36 Issue 3, pp.237 - 251.

Barrientos, A., J. Byrne, J. M. Villa and P. Peña (2013): "Social Transfers and Child Protection," *Working Paper* 2013-05, UNICEF Office of Research, Florence.

Basu, K. and P. H. Van (1998): "The Economics of Child Labor," *American Economic Revie*w 88(3): 412-427.

BBS. *Child Labor Survey Bangladesh 2013*. Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka, Bangladesh.

BBS. *Household Income and Expenditure Survey Preliminary Report (HIES)* (2016): Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka, Bangladesh.

Behrman, Jere R. and J. C. Knowles (1999): "Household Income and Child Schooling in Vietnam," *World Bank Economic Review* 13(2): 211-56

Bollig, K. (2015, August): *A Review of the Effectiveness and Potential of Social Protection Programmes in Addressing Child Labour in the Philippines (*ILO Social Protection Floor Initiative) Retrieved from ILOwebsite: https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=49757

Gahlaut, A. (2011): "An Analysis of the Juntos Cash Transfer Program in Peru, with Special Emphasis on Child Outcomes." Young Lives Student Paper.

Hasan, M. K. (2017): "*A B C D of Social Protection in Bangladesh,"* SSPS program, Cabinet Division and General Economics Division, Government of Bangladesh.

Heckman, J. and D. Masterov (2007): *The Productivity Argument for Investing in Young Children*. University of Chicago.

https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/6333d00d_b8ae_45fd_b0d5_d07e98760bde/Child%20Budget%202018-19_English.pdf

ILO (2013): *World Report on Child Labor: Economic Vulnerability, Social Protection and the Fight against Child Labour,* International Labor Office, Geneva.

ILO (2014): *World Social Protection Report 2014-15: Building Economic Recovery, Inclusive Development and Social Justice,* Brookings Institution Press.

ILO (2017): *World Social Protection Report 2017-19: Universal Social Protection to Achieve the Sustainable Development Goals*.

Kidd, S., B. Khondker, N. Khan and T. Ahsan (2017): "*Building a Social Protection System to Address the Demographic Challenges Faced by Bangladesh*," Background research papers for Preparing the National Social Security Strategy of

Bangladesh, edited by Alam, S., General Economics Division, Planning Commission.

Ministry of Finance (2017): *A Diagnostic Study on Stipend Programmes in Bangladesh with Focus on Primary Education Stipend Project* (PESP),http://spfmsp.org/wp-content/uploads/2018/02/PESP-Final-Report-26.12.2017-GoB.pdf

Minujin, A., *et al*. (2006): The Definition of Child Poverty: A Discussion of Concepts and Measurements, International Institute for Environment and Development (IIED), Vol 18(2): 481-500.

MoF. *Budget Documents 2018-19*. Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh.

MoF. *Child Budget, 2018-19*. Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. https://mof.portal.gov.bd/site/page/13b6bd26-b886-4a5e-bf63-bf0c1b2b4d8f

Planning Commission (2015): *National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh*.General Economics Division, Planning Commission.

Rahman, A K M Fazlur and Sohel Rana (2016): "Migration and Its Effect on Extreme Poor Households' Trajectories," *Working Paper* 32, EEP/Shiree, Dhaka, Bangladesh.
. http://www.shiree.org/wp-content/uploads/2012/02/32-Migration-and-its-effect-on-extreme-poor-households-trajectories-JO-proof.pdf

Ravallion, M. and Q. Wodon (2000): "Does Child Labour Displace Schooling? Evidence on Behavioural Responses to an Enrollment Subsidy," *The Economic Journal*, 110(462), C158-C175. Retrieved January 22, 2019, from www.jstor.org/stable/2565729

Sanfilippo, M., C. de Neubourg and B. Martorano (2012): "*The Impact of Social Protection on Children: A Review of the Literature." Working Paper* 2012-06, UNICEF Office of Research, Florence.https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp_2012_ 06.pdf.

Save The Children (2014): "*Putting Child Sensitive Social Protection into Practice in Bangladesh*." *Approach Paper*, Save The Children, Finland.

Singh, S. and S. McLeish (2013): "Social Protection and its Effectiveness in Tackling Child Labour: The Case of Internal Child Migrants in Indonesia." Conference paper, Child Poverty and Social Protection Conference Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta 10–11 September 2013.718-740. http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/cpsp_2.pdf.

UNICEF (2010): *Understanding Urban Inequalities in Bangladesh: A Prerequisite for Achieving Vision 2021*, United Nations Children's Fund. Dhaka, Bangladesh.

UNICEF, ILO and World Bank Group (2009): Understanding Children's Work in Bangladesh, June (unpublished), [online]. Available at: http://www.unicef.org/bangladesh/Child_labour.pdf [Accessed: 12 March 2014].

Wagmiller Jr R. L., and R. M. Adelman (2009): *Childhood and Intergenerational Poverty: The Long-Term Consequences of Growing Up Poor*, The National Centre for Children in Poverty, Colombia University, USA.

WFP (2018): *Final Evaluation of McGovern-Dole-supported School Feeding Programme in Bangladesh*, Evaluation Report. (Available at https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP-0000101229.pdf)

World Bank (2016): "Bangladesh Social Protection and Labor Review: Towards Smart Social Protection and Jobs for the Poor." *Bangladesh Development Series*, Paper No.33.http://www.worldbank.org.bd/bds.

World Bank (2018): Cash Transfer Modernization Project, Report No: PAD2224. http://documents.worldbank.org/curated/en/258451517626830719/pdf/BANGLADESH-PAD-01112018.pdf (cited on 5 November 2018)

Zaman, S., S. Matin and A.M.B.G. Kibria (2014): "A Study on Present Scenario of Child Labour in Bangladesh," *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, Volume 16, Issue 6. Ver. III (Jun.), 25-36.